Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পশ্চিমা সভ্যতা নাকি ইসলামি সভ্যতা কোনটি আমার পছন্দ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে হাবিবা

রোলঃ 227021707

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পশ্চিমা সভ্যতা নাকি ইসলামি সভ্যতা কোনটি আমার পছন্দ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে হাবিবা

রোলঃ 227021707

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ পশ্চিমা সভ্যতা নাকি ইসলামি সভ্যতা কোনটি আমার পছন্দ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উম্মে হাবিবা, আইডিঃ 227021707 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পশ্চিমা সভ্যতা নাকি ইসলামি সভ্যতা কোনটি আমার পছন্দ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

উম্মে হাবিবা

আইডিঃ 227021707

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: সভ্যতার স্বরূপ

সঙ্গায়ন

সভ্যতার বিকাশ

সভ্যতার উত্থান-পতন

অধ্যায় ২: পশ্চিমা সভ্যতার আদ্যোপান্ত

পশ্চিমা সভ্যতার গোড়াপত্তন

খ্রিষ্ট ধর্মের আবির্ভাব ও প্রভাব

নতুন ভাবে জেগে উঠা: রেঁনেসা

রিফোর্মেশন আন্দোলন

এনলাইটেনমেন্ট

আধুনিকতা

অধ্যায় ৩: ইসলামি সভ্যতার ইতিবৃত্ত

ইসলামের সূর্যোদয় : নবুওয়াত প্রাপ্তি

মক্কার দাওয়াতি কার্যক্রম

হিজরত

ইসলামি রাষ্ট্র বিনির্মাণ

উল্লেখযোগ্য কিছু সারিয়্যা ও গাজওয়া

- *বদর*
- *উহুদ*
- *খন্দকের যুদ্ধ (গাযওয়াতুল আহযাব)*

হুদায়বিয়ার সন্ধি

বিভিন্ন রাজা-বাদশার নিকট নবীজির পত্র প্রেরণ

বাইজেন্টাইনদের মুখোমুখি (মুতার যুদ্ধ)
মক্কা বিজয়
নবীজির অন্তিম যুদ্ধ
নবীজির ওফাত

অধ্যায় ৪: ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি বনাম পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তি
ভিত্তি সমূহের প্রভাব

অধ্যায় ৫: সভ্যতায় সভ্যতায় দ্বন্দ্ব

অধ্যায় ৬: পশ্চিমা কিছু মতবাদ ও ইসলামের অবস্থান
বস্তুবাদ
ডারউইনিজম
সেকুলারিজম
গনতন্ত্র
পুঁজিবাদ

অধ্যায় ৭: অনুকরণের বেড়াজাল

অধ্যায় ৮: পশ্চিমা সভ্যতা নাকি ইসলামি সভ্যতা কোনটি আমার পছন্দ

অধ্যায় ৯: উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

যেকোনো সভ্যতার বুনিয়াদ হলো আকিদা ও বিশ্বাস। এবং সমস্ত সভ্যতাই তা ছোট হোক বা বড়, দীর্ঘমেয়াদি হোক বা স্বল্পমেয়াদি, তা গড়ে ওঠে একটি বিশ্বাসগত কাঠামোর উপর। কোনো সভ্যতার আকিদা-বিশ্বাস যদি গভীর থেকে উপলব্ধি করা যায়, তা হলে দূর থেকেও খুব সহজেই সে জাতির জীবনের ছক পূরণ করা যায়। তাই কোনো সভ্যতা তা বাহ্যত যতই উন্নত হোক, তার মূল্যায়ন হবে তার আকিদা-বিশ্বাস দিয়ে।

নানা আন্দোলন ও সংস্কার পাড়ি দিয়ে বিগত কয়েক শতক থেকে ইউরোপ-আমেরিকার যৌথ আকিদা-বিশ্বাস, পরস্পর অর্থায়ন ও সাংস্কৃতিক মিলনের বদৌলতে যে নতুন সভ্যতার সৃষ্টি ও জয়জয়কার হয়েছে, আমরা একে পশ্চিমা সভ্যতা বলে জানি। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, মানুষের জীবনে প্রভাব সৃষ্টিকারী এটি একটি জাদুকরী সভ্যতার। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক এই জীবনব্যবস্থা বা সভ্যতার প্রধান আকর্ষণ হলো এর সহজতা এবং রাষ্ট্রকর্তৃক ব্যক্তিকে তার সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বেচ্ছাচারিতার অনুমোদন দেওয়া। মানুষের জন্য এরকম সহজ ও সাধারণ ভিত্তি, এবং মানুষের সকল প্রকার চাহিদা পূরণকারী দ্বিতীয় কোনো সভ্যতা নেই। এতে কোনো গভীরতা, কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি এবং কোনো ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রয়োজন নেই। তাই সাধারণ মানুষের নিকট এটি খুবই আকর্ষণীয় এবং মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এর চেয়ে অধিক পৌনঃপুনিক জয়লাভকারী কোনো সভ্যতা বা জীবনব্যবস্থা দেখা যায়নি।

অন্যদিকে ইসলামি সভ্যতা ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়, যা অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বের একটি বৃহৎ অংশকে আপন সুষমায় মোহিত করেছিল। ইসলামের প্রথম যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে, এই সভ্যতা নৈতিকতা, জ্ঞান, সংস্কৃতি, এবং আধ্যাত্মিকতার

এমন এক অনন্য সমন্বয় গড়ে তোলে, যা ইতিহাসে বিরল। মূলত ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করেই এই সভ্যতার সৃষ্টি। সৃষ্টি জগতের রব আল্লাহ (سبحانه وتعالى) এই ধর্মকে মনোনীত করেছেন সমগ্র মানবজাতির জন্য। কুরআনে আল্লাহ বলেন :

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম।" (সূরা আলে ইমরান: ১৯)

একজন বিশ্বাসী (মুমিন) হিসাবে তরান্বিত পশ্চিমা সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে চললে দুনিয়া ও পরকালের সফলতা আনায়ন সম্ভব নাকি আল্লাহর মনোনীত দ্বীনকে কেন্দ্র করে যে সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে সেই সভ্যতার মাধ্যমে সম্ভব। ইন শা আল্লাহ উক্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টা করবো এই লেখনীর মধ্য দিয়ে –

সভ্যতার স্বরূপ

- **সঙ্গায়ন**

ইংরেজি Civilization-এর বাংলা অর্থ করা হয়েছে সভ্যতা। সমাজবিকাশের পদ্ধতি বা পর্যায় বিশেষ। Oxford English Dictionary অনুসারে ইংরেজি Civilize শব্দটির অর্থ হলো-আদিম বা অজ্ঞ অবস্থা থেকে উন্নতর অবস্থায় তুলে আনা, সভ্য করা, উন্নত ও শিক্ষিত করা।

বাংলা ভাষায় সভ্যতার আভিধানিক অর্থ হলো শিষ্টতা, সামাজিকতা, জীবনযাত্রা, জীবনযাত্রা প্রণালির উৎকর্ষতা। সভ্যতা শব্দের উৎপত্তি সভা হতে এবং সভার অর্থ হলো যা সকলকে নিয়ে শোভা পায়, এ অর্থে সভ্যতার অন্যতম অর্থ- সামাজিক সুসংগত। যে অবস্থায় মানুষের সামাজিক জীবন প্রতিভাত হয়, তার বিকাশ বা উন্নতি হয় তাই সভ্যতা। এটি মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালির শোভনতার পরিচয়।

আবার 'সভ্যতা' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Civilization যা ল্যাটিন শব্দ Civilis থেকে এসেছে। Civilis এর অর্থ নাগরিক। ইংরেজি প্রতিশব্দের বিবেচনায় আক্ষরিক অর্থে সভ্যতা বলতে সুসংহত নগর বা রাষ্ট্রের নাগরিক জীবনের অর্জিত গুনাবলি গুলোকে বোঝায়।

সভ্যতা বলতে অনেকে বস্তুগত উৎকর্ষতাকে বুঝিয়েছেন। এ অর্থে সিজন পা প্রযুক্তির সব বস্তুগত আবিষ্কারের ফলকে একত্রে সভ্যতা বলা হয়; বিভিন্ন প্রসং কারিগরি কলা-কৌশল ও বাস্তব যন্ত্রপাতিও এর অন্তর্ভুক্ত।

সারকথা, সভ্যতা বলতে আমরা বুঝি মানুষ তার জীবনধারণের জন্য যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সংগঠন সৃষ্টি করেছে তারই সামগ্রিক রূপ। কেবল যে আমন্ডে সামাজিক সংগঠনের নানারূপ রীতি এর অন্তর্গত হয়েছে তা নয়, কলাবিদ কারিগরি কলা-কৌশল ও বাস্তব যন্ত্রপাতিও এর অন্তর্ভুক্ত।
অথবা বিষয়টি এভাবেও বলা যায় 'সভ্য জাতির জীবনযাত্রা নির্বাহের পদ্ধতি- সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম ও বিবিধ বিদ্যার অনুশীলনহেতু

মন-মগজের উৎকর্ষ সাধন।'

- **সভ্যতার বিকাশ**

আধুনিক জাতিরাষ্ট্রগুলো নির্দিষ্ট সীমানা নিয়ে তৈরি হলেও সভ্যতার সাধারণত কোনো পরিষ্কার সীমারেখা থাকে না। বরং, সভ্যতাগুলো অনেকগুলো জাতিরাষ্ট্র নিয়ে তৈরি হয়, তৈরি হয় অনেকগুলো জাতিরাষ্ট্রের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অংশ নিয়েও। সভ্যতার কোনো নির্দিষ্ট শুরু থাকে না, থাকে না নির্দিষ্ট সমাপ্তি। অনেকগুলো স্বতন্ত্র জীবনবোধ আর রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সভ্যতা, আবার কালের প্রবাহে অনেক সময় হারিয়ে যায় সভ্যতা। প্রতিটি সভ্যতা অস্তিত্বের বিভিন্ন সময়ে উত্থান-পতন থাকে, পরিবর্তিত হয় সভ্যতার বিকাশ আর বিস্তৃতির গতিপ্রকৃতি। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সাথে সভ্যতার আকারের পরিবর্তন হয়, কালের আবর্তে একসময় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে সভ্যতার মাধ্যমেই মানুষ তার পরিচয়কে নতুন করে সন্ধান করছে, নিজেকে পরিচিত করছে নতুন পরিচয়ে। ফলে, বর্তমানে সভ্যতার মাধ্যমেই মানুষ সবচেয়ে বিস্তৃত সাংস্কৃতিক পরিচয় ধারণ করছে, সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য সামনে রেখে তৈরি করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সভ্যতাকেন্দ্রিক পরিচয়ের মাধ্যমেই একজন মানুষ বাকি সকল মানুষ থেকে নিজের পরিচয়কে আলাদা করছে, আলাদা করছে নিজের বিশ্বস্ত মানুষের পরিধি।

- **সভ্যতার উত্থান-পতন**

রাজনৈতিক সক্ষমতা আর সংঘাতের উৎপাদনের ক্ষমতা ব্যবহার করে সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়, এই উপাদানগুলো ব্যবহার করেই সভ্যতার বিকাশ ঘটে। সময়ের সাথে সভ্যতার বিস্তৃত

ঘটে, সভ্যতার মৌলিক মূল্যবোধগুলোতে রূপান্তর ঘটে, পরিবর্তন হয় সভ্যতার সীমা আর জনসংখ্যাও। আবার, সময়ের সাথে সাথে সভ্যতা নতুন নতুন উপাদান গ্রহণ করে, নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতাকে সামনে রেখে সভ্যতা নিজেকে পরিবর্তিত করে।
রাজাদের যুদ্ধনীতি আর রাজনৈতিক কৌশলকে সঙ্গে নিয়ে সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে, সময়ের সাথে ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যগুলোর পতন ঘটে। সরকার আসে, মেয়াদ শেষে আবার সরকারের বদল ঘটে। সভ্যতা এই উত্থান-পতনের মাঝে টিকে থাকে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতাগুলো সঙ্গে নিয়ে, রাজনৈতিক দর্শনে ভিন্নমত নিয়ে। সভ্যতা রাজনৈতিক আর সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ দিন টিকে থাকলেও, একসময় সভ্যতার মৃত্যু ঘটে, কালের আবর্তে হারিয়ে যায় সভ্যতা। ধর্মকেন্দ্রিক সভ্যতাগুলো তুলনামূলকভাবে দীর্ঘজীবী হয়।

পশ্চিমা সভ্যতার আদ্যোপান্ত

পশ্চিমা সভ্যতা (Western Civilization) একটি বহুমুখী এবং প্রাচীন সভ্যতা যা মূলত ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে বিকশিত হয়েছে এবং এই সভ্যতা বিশ্বের অনেক অঞ্চলে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এটি গ্রীক-রোমান সভ্যতা, খ্রিস্টান ধর্ম, মধ্যযুগ, রেনেসাঁস, আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক বিপ্লব, এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে।

- **পাশ্চিমা সভ্যতার গোড়াপত্তন**

পশ্চিমা সভ্যতার মূল কেন্দ্র হলো ইউরোপে। পশ্চিমা সভ্যতাকে প্রায়ই গ্রিক-রোমান সভ্যতা হিসেবে অভিহিত করা হয়। কারণ এর সূচনা হয়েছিল মূলত গ্রিস এবং রোমে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় গ্রিক ও রোমান সভ্যতার প্রভাব খুবই স্পষ্ট।

গ্রিক-দর্শনের প্রধান মনোযোগ ছিল বস্তুজগৎ। তাদের চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরকালের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এই বস্তুবাদী চেতনাই পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলে বিরাজ করছে। এছাড়া গ্রিক সভ্যতায় প্রতিটি বিষয়কেই স্বাধীনচেতা মানুষের দৃষ্টিতে দেখা হতো। যে বিষয়টিই তাদের এমন মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে যেত, তাকে মন্দ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করত। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতায় এই প্রবণতা 'হিউম্যানিজম'-এর রূপ ধারণ করেছে।

তখনকার সময় ছেলেমেয়েরা একসাথে নাচ-গান, খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করত। অনেক সময় সেখানে উলঙ্গ হয়ে পারফরমেন্স করা হতো। যাত্রা থিয়েটারের আয়োজন করত পুণ্যের আশায়। তারা ধারণা করত এতে তাদের প্রভু খুশি হয়। প্রাচীন গ্রিসে অলিম্পিক গেইমসের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসত এবং অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে খেলায় অংশগ্রহণ করত। দৌড়, কুস্তি, নৌকাবাইচ ছাড়াও বিভিন্ন খেলার ব্যবস্থা থাকত।

এগুলো নিছক কিছু উদাহরণ, যেখানে গ্রিক ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও চিন্তার মিল রয়েছে। **গ্রিক সভ্যতায় এরকম অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে, যেগুলো পাশ্চাত্যে আরো উন্নত, ব্যাপকভাবে বিরাজ করছে।**

গ্রিস এবং রোমে মূর্তিপূজাই ছিল তাদের আনুষ্ঠানিক ধর্ম। তারা নানা রকম দেবতার উপাসনা করত। তারা মনে করত মানুষ এবং সেই দেবতাদের মধ্যে পার্থক্য হলো কেবল এই যে, দেবতারা অমর আর মানুষ মরণশীল; এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিভিন্ন ঘটনার সবকিছু এই দেবতারাই নিয়ন্ত্রণ করছে। যেমন, দেবতা জিউস (zeus) আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে, পসেইডন (Poseidon) এর হাতে আছে সমুদ্রের কর্তৃত্ব, ফল-ফসলের মালিক দেবতা

ডেমেটার (Demetar)। আরও আছে হেরা (Hera), যে হচ্ছে বিয়ের দেবী, আছে ফরচুনা (Fortuna), যার হাতে আছে ভালো-মন্দ অর্থাৎ ভাগ্যের চাবিকাঠি, ডায়ানা (Diana) হচ্ছে প্রেমের দেবী, এরকম আরও অনেক। গ্রিক পুরাণ মতে, প্রধান দেবতা জিউস (Zeus রোমে যাকে জুপিটার হিসেবে অভিহিত করা হয়) এর নেতৃত্বে অলিম্পাস পাহাড়ে এই দেবতাদের বসবাস। মানুষের অবয়বে মূর্তি বানিয়ে এই দেবতাদের পূজা করা হতো। আর তাদের উপাসনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিলো, এসব দেবতাদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশু বলি দেওয়া। দেবতাভেদে বলির পশুও ভিন্ন ভিন্ন হতো। যেমন, হেরা দেবীর জন্য উৎসর্গ করা হয় গরু, জিউস এর জন্য ষাঁড়, আর দেবতা ডেমেটার'র জন্য বলি হতো শূকর।

প্রাচীন গ্রিক, রোমান এবং অন্যান্য ইউরোপিয়ান জাতিগুলোর মাঝে যে পৌত্তলিক চেতনা বিদ্যমান ছিল, তার প্রমাণ এখনো পশ্চিমা সভ্যতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়; যদিও বা তাদের জীবন থেকে ধর্মীয় অনুশাসন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যেমন, প্রতিটি দিনের নামের কথাই ধরুন। প্রতিটি দেশেরই নিজ ভাষায় সপ্তাহের প্রতিটি দিনের নাম আছে, তবে ইংরেজি নামগুলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এগুলোর সাথে পৌত্তলিকতার ওতপ্রোত সম্পর্ক বিদ্যমান। রোমানরা যে দিন যে গ্রহের উপাসনা করত, সে দিনের নাম রাখা হয়েছে সেই দেবতার নামের সাথে মিল রেখে। শনিবার বা Saturday শব্দটির উৎপত্তি প্রাচীন ইংরেজি শব্দ Saeterndaeg থেকে, যার মানে হচ্ছে 'শনি বা Saturen এর দিবস' (Saturn-স্যাটার্ন হলো রোমানদের কৃষিদেবতা)। রবিবার বা Sunday এসেছে প্রাচীন ইংরেজি শব্দ Sunnandaeg থেকে, যার অর্থ হলো 'সূর্য দিবস', আর সোমবার বা Monday এসেছে প্রাচীন ইংরেজি শব্দ Monandaeg থেকে। সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলোর নামের উৎপত্তি জার্মান পুরাণে দেবতাদেরকে যে নামে অভিহিত করা হতো সেগুলোর ব্রিটিশ- ফরাসি প্রতিশব্দ থেকে। যেমন, মঙ্গলবার, ইংরেজিতে বলা হয় Tuesday, এটি এসেছে Tiwesdage থেকে, এর মানে হলো Tiw (Tiw হলো Tyr নামক নরওয়েজিয়ান যুদ্ধদেবতার নামের ইংরেজি-ফরাসি প্রতিশব্দ) এর দিবস। বুধবার বা Wednesday এসেছে Wodnesdaeg থেকে, এর মানে Woden এর দিবস, সে জার্মানদের প্রধান দেবতা। বৃহস্পতিবার বা Thursday এসেছে Thunor (Thor) থেকে, বজ্রদেবতার ইংরেজি-ফরাসি প্রতিশব্দ অনুসারে। আর শুক্রবার এসেছে Frigedaeg থেকে, যার অর্থ দেবী ফ্রিগ (Frig)

এর জন্য নির্ধারিত দিবস। সৌন্দর্য আর ভালবাসার দেবী ফ্রিগ (Frig) হচ্ছে দেবতা Woden এর স্ত্রী।

রোমান সভ্যতা দ্বারাও পাশ্চাত্য সভ্যতা সমান ভাবে প্রভাবিত। রোমান সভ্যতা মূলত নিজেই বিভিন্ন সভ্যতার সংমিশ্রণ ছিল। এটার কারণ হলো, পূর্বে রোমানদের ভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা ছিল। যখন রোমানরা গ্রিস জয় করে নিল, তখন গ্রিক সভ্যতা রোমান সভ্যতায় স্থানান্তরিত হতে থাকে। তারা প্লেটো (খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৩/২৪-৩৪৭/৪৮) এবং অ্যারিস্টটলের চিন্তাধারা প্রত্যাখ্যান করলেও আবার গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাসের (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪১-২৭০) দর্শন গ্রহণ করে। তার দর্শনের ভিত্তি ছিল মানবীয় প্রবৃত্তি। উপকরণ সংগ্রহ এবং ভোগ-সুখই জীবনের সার্থকতা। ফলে রোমানদের জীবনযাপন পদ্ধতি ছিল বিলাসবহুল এবং আয়েশি। এভাবে গ্রিক দর্শন, রোমান জীবনাচার এবং আশেপাশের নানান তৎপরতা মিলে রোমান সভ্যতা অস্তিত্ব লাভ করে। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে রোমানরা দুর্বল ছিল। কিন্তু সামরিকভাবে শক্তিশালী ছিল। সামরিক শক্তির বলেই তারা নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক এবং বাণিজ্যিকভাবে উন্নত করতে পেরেছিল।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় যেসব রোমান দর্শনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমিত্ব ও বিলাসিতা। পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভবত রোমানরাই একমাত্র জাতি, যারা এটাকে দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

দর্শনের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও রোমান সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্যের মিল দেখা যায়। যেমন গণতান্ত্রিক রূপরেখা, ব্যাংকিং সিস্টেম। প্রাচীন রোমান সমাজে এগুলোর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।

খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর দুই বড় সাম্রাজ্যেই গণতান্ত্রিক সিস্টেম ছিল। গ্রিসে যখন সক্রেটিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭০-৩৯৯)-কে বিষ পান করানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তখন রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক ছিল। এমনিভাবে প্রথমদিকে রোমান সাম্রাজ্যও গণতান্ত্রিক কাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেমন: কাদিম তাহজিবে আওর মাজহাব (প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্ম) গ্রন্থে আছে, 'রোমান

সাম্রাজ্যে আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা ছিল সিনেট অথবা সিনেটকর্তৃক মনোনীত কমিশনারের হাতে।'

গণতন্ত্র, ব্যাংকিংসহ অনেক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবস্থাপনাই আধুনিক কালের আবিষ্কার নয় এবং এগুলো ইসলাম থেকেও গৃহীত নয়; বরং গ্রিক ও রোমান সভ্যতা থেকেই এসব গ্রহণ করা হয়েছে। অন্ততপক্ষে এতটুকু বলা যায় যে, গ্রিক ও রোমান সভ্যতায় সেগুলোর অস্তিত্ব ছিল। তবে এগুলোর বিশ্বায়ন এবং পরিকল্পনা-মাফিক প্রয়োগ আধুনিক ইউরোপে হয়েছে।

- **খ্রিষ্ট ধর্মের আবির্ভাব ও প্রভাব**

ইউরোপের সাথে খ্রিষ্ট ধর্মের সম্পর্ক হাজার বছরের। মূলত একজন ইহুদি পন্ডিত **'Paul'** এই ধর্মের প্রবক্তা।

খ্রিষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ অনুসারেও যীশু এসেছিল শুধুমাত্র ইহুদিদের জন্য। একস্থানে যীশু বলছেন : "These twelve Jesus sent out with the following instructions: Do not go onto the road of the Gentiles or enter any town of the Samaritans, Go rather to the lost sheep of Israel, [Matthew 10:5-7)

এই বারো জনকে যীশু এই নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন অ-ইহুদিদের (জেন্টাইল) রাস্তায় যেয়ো না কিংবা সামারিটান (ইহুদিদের এক গ্রুপ)-দের কোনো শহরে প্রবেশ কোরো না। বরং ইসরাইলের হারানো ভেড়াদের (নবি ইসহাকের পথভ্রষ্ট সন্তানদের) কাছে যাও। (মানে কেবল ইহুদি ডায়াস্পোরাগুলোতে দাওয়াহ করতে বলেছেন)। "

কিন্তু স্বঘোষিত শিষ্য ও 'সাবেক শত্রু' পল ঈসা-নবির বা যীশুর দাওয়াহর মধ্যে কিছু সংস্কার আনল, যার মধ্যে প্রধান হলো ঈসা আলাইহিস সালামকে ইহুদিদের নবি থেকে বিশ্বনবি ঘোষণা। পল নিজেকে ঘোষণা করল 'অ-ইহুদিদের প্রতি প্রেরিত' (apostle to the gentiles), যেটা করার কথা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে পল ঈসা আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় শিষ্য ছিল না, তীব্র শত্রু ছিল; কিন্তু এখন তাকে সরাসরি শিষ্যদের সমান মনে করা হয়। অ-ইহুদিদের দাওয়াহ করার ক্ষেত্রে পল তাওরাতের আইনকে শিথিলভাবে উপস্থাপন করত, ক্ষেত্রবিশেষে 'অপ্রয়োজনীয়' হিসেবে। যেমন খতনা করার দরকার নেই, মদ্যপান চলবে, শনিবার পালনের দরকার নেই, শুকর খাওয়ার নিষেধ নেই ইত্যাদি।

বস্তুবাদী মূর্তিপূজক রোমানরা পলের খ্রিষ্টীয় আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া পেয়ে আকৃষ্ট হয়। তখন একটা প্রশ্ন ওঠে অ-ইহুদিদের খ্রিষ্টান হতে হলে আগে ইহুদি হতে হবে কি না, খৎনা, শনিবার পালন, খাবারে বাছবিচার এগুলো করতে হবে কি না। ৪৯ সালে জেরুসালেমে apostolic council-এ সিদ্ধান্ত হয়, মুশরিকরা ইহুদি না হয়েই খ্রিষ্টান হতে পারবে। মূলত খ্রিস্টানরা হচ্ছে সেন্ট পলের অনুগত অনুসারী। এরা তাওরাতের বিধান থেকে দূরে সরে গেলেও খ্রিস্টীয় ন্যায়-নৈতিকতা, মৃত্যু পরবর্তী জীবন ও আধ্যাত্মিকতা ভোগবাদী রোমানদেরকে উন্নত চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতার স্বাদ পাইয়ে দেয়। মূলত তাওরাতের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ সম্পর্কিত বিধান বাদ দিলেও ব্যক্তিগত চরিত্র-আধ্যাত্মিকতা এসবে পলীয় খ্রিস্টবাদ খুব জোর দিয়েছিল। রাষ্ট্রের আনুগত্যের নীরস আচার-পার্বণ থেকে ধর্মের আনুগত্যের বর্ষণ তাদের আকৃষ্ট করতে থাকে। আবার রোমান মুশরিক সংস্কৃতির নানান দিকও খ্রিস্টবাদে ধুমসে প্রবেশ করে: ২৫ ডিসেম্বর পালন (ছিল সূর্যদেব অ্যাপোলোর জন্মদিন, হয়ে গেল খ্রিস্টের জন্মদিন), ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর প্রভুত্ব আরোপ, আল্লাহর পুত্র মনে করা (রোমান পুরাণের কনসেপ্ট), মূর্তি তৈরি, শনিবারের বদলে রবিবার (SUN-day) বিশ্রাম দিবস- ইত্যাদি তাদের প্যাগান চিন্তাচেতনার সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য অনুমোদিত হয়।

প্রভাব :

বর্তমানে ইউরোপে যে ধর্মীয় বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয় এর পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে এই খ্রিষ্ট ধর্মের আর্বিভাব পরবর্তী ঘটনাবলী। বর্বরতার জন্য সেই যুগকে অন্ধকার যুগও বলা হয়। এই বর্বরতার সূচনা হয় বৈরাগ্যবাদের মধ্য দিয়ে।

গ্রিক সভ্যতায় একটা সময় স্টোয়িকবাদ (stoicism) নামক বৈরাগ্যবাদ চর্চা হতো, যা রোমানদের হয়ে খ্রিস্টধর্মে স্থান পায়। তাদের মতে অপবিত্র পৃথিবীতে মানুষ পদস্থলিত হয়েছে আদম আলাইহিস সালামের আদিপাপের কারণে, যা লেপ্টে আছে প্রতিটি মানুষের গায়ে। সেই পাপ থেকে মুক্তি পেতে ও খ্রিস্টের প্রিয়পাত্র হতে হলে এই নশ্বর ঘৃণ্য দুনিয়ার চাহিদা, ভোগকে অবদমন করতে হবে। দুনিয়ার সম্পর্ক-সম্পদ ত্যাগ করে মঠবাসী জীবন বেছে নিতে হবে, সারাজীবন যাজক-নানরা বিয়ে করতে পারবে না। এছাড়া তারা আরও যেসব বিভৎস আচার পালন করতো সেগুলো *William Edward Leckey* 'তার *History Of European Morals* গন্থে বর্ননা করেছেন -

- ৩০ বছর যাবৎ দিনে ১টি রুটি খেয়ে কাটানো
- গর্তে বসবাস ও প্রতিদিনের খাবার ৫টি ডুমুর
- বছরে একবার চুল কাটা, ময়লা কাপড় পরা
- ইচ্ছে করে মাছিকে দেহে কামড়ানোর সুযোগ দেওয়া
- শরীরে ৮০ পাউন্ড, ১৫০ পাউন্ড সবসময় লোহা বহন করা
- ৩ বছর শুকনো ইঁদারার ভেতর বসবাস
- ৪০ দিন ৪০ রাত কাঁটাঝোপে অবস্থান

- ৪০ বছর বিছানায় গা না লাগিয়ে ঘুমানো
- এক সপ্তাহ যাবৎ কিচ্ছু না খাওয়া, না ঘুমোনো
- পানি স্পর্শ না করা। পানি ছোঁয়া, পা ধোয়া, হাত ধোয়াকে পাপ মনে করা।
- শরীরে এমনভাবে রশি বেঁধে রাখা যাতে শরীর কেটে পোকা ধরে যায়।
- ১ বছর যাবৎ দাঁড়িয়ে থাকা
- পরিবারের সাথে আর কোনোদিন দেখা না করা
- চোখ ঝাপসা না হওয়া অব্দি উপোস করা

মায়া প্রেম চাহিদার এমন পৈশাচিক অবদমনের কারণে মঠগুলো হয়ে ওঠে গোপন কিন্তু অবাধ যৌনতার লীলাভূমি। কুমারী নারীদের সাথে সহাবস্থান ও সম্পদের অবাধ প্রবাহ স্বয়ং মঠাধ্যক্ষদেরও ইন্দ্রিয়পুজার দিকে ঠেলে দেয়। কোনো সেইন্ট ধরা খেলে পোপের পক্ষ থেকে এর শাস্তি ছিল বড়জোর অন্য মঠে বদলি বা বাধ্যতামূলক অবসর। ফলে সাধারণ জনগণ ও রাজক্ষমতার কাছে যাজকদের মর্যাদা কমতে থাকে। ঘৃণা এমন তীব্র হয় যে, একসময় 'মঠবাসী' পরিণত হয় গালিতে।

ধর্মীয় বিদ্বেষের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছিল **চার্চতন্ত্র**। রোমান ক্যাথলিক চার্চ গড়ে তোলে যাজকতন্ত্র, যার শীর্ষে পোপ। পোপ নিয়োগ দিতেন দেশে দেশে প্রধান আর্চবিশপ। আর্চবিশপের অধীনে অন্যান্য চার্চ বা মঠে বিশপ নিয়োগ হতো। এই চার্চতন্ত্র ছিল রাজা-জমিদারদের পাশাপাশি আরেক প্যারালাল ব্যবস্থা। এরা কিছু কর আদায় করত, শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করত। টাইথ, অ্যানেট ইত্যাদি বিভিন্ন নামে নানা প্রকার ধর্মীয় কর

আদায় করা হতো রাজা ও বিশপদের থেকে। ক্রমেই বেড়ে চলছিল এই দাবি। পোপের কোষাগারকে বলা হতো 'unbottomed sack of Rome', রোমের অতলান্ত থলে।

যাজকশ্রেণির জীবনযাত্রা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিজাতদের চেয়েও ভোগবাদী ছিল। জার্মানির এক-তৃতীয়াংশ ও ফ্রান্সের এক-পঞ্চমাংশ সম্পদের মালিক ছিল চার্চ, কিন্তু পার্লামেন্টের প্রকিউরার জেনারেল ১৫০২ সালে হিসেব করে দেখান, ফ্রান্সের তিন-চতুর্থাংশের মালিক চার্চ। ইতালির এক-তৃতীয়াংশ ভূমির মালিক চার্চ। বিষয় টা তখন এমন যে একদিকে দুনিয়াত্যাগের ডাক, অন্যদিকে নিজেরাই দুনিয়ার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তাছাড়া পোপ নিজেই বিশাল এক এলাকা সরাসরি শাসন করত, যাকে বলা হতো Papal State!
চার্চের এই অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির ফলে রাষ্ট্র প্রধানদের সাথেও সংঘাত বাড়ছিল পোপ ও বিশপদের। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছিল এই সংঘাত।

চার্চের জুলুম নীতিও জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। ক্যাথলিক চার্চের ধর্মীয় আদালতের নাম ছিল Inquisition। তাদের শাস্তির দেওয়ার মাধ্যম ছিল ভয়ানক বিভৎস।

- Iron Maiden একটা শলাকাযুক্ত আলমারির মতো। ভেতরে লোক ঢুকিয়ে পাল্লা লাগিয়ে দিলেই এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যেত।

- Scold's Bridle মাথায় পরিয়ে মুখরা নারীকে বাজারে ঘোরানো হতো।

- Breast Ripper দিয়ে নারীদের স্তন ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হতো।

- Heretic's Fork লাগিয়ে থুতনি গলা দুদিকেই ঢুকে যাবে ঘুমে মাথা ঝুঁকে এলেই।

- Wooden horse-এর ওপর বসিয়ে ঘোড়াকে লাফালে লিঙ্গ-যোনি-অণ্ডকোষ ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত।

- Spanish Boot-এর প্যাঁচ কষে পা থেঁতলে নীল করে দেওয়া হতো।

অ-ক্যাথলিক খ্রিস্টান, মুসলিম-ইহুদি, জোয়ান অব আর্ক এবং নাইট-টেম্পলারদের বিচারের নামে নির্যাতন, হত্যার মিছিল চলে কয়েক শতাব্দীজুড়ে। ডাইনি-নিধনের (witch-hunt) নামে ১৪৫০-১৭৫০ পর্যন্ত তিনশত বছরে ৫-৭ লাখ মানুষ হত্যা করা হয়েছিল, যাদের ৮০% ছিল নারী। ২০০ বছরে শুধু স্প্যানিশ ইনকুইজিশনে হত্যা করা হয় ৩২ হাজার মানুষ, শাস্তি-নির্যাতন করা হয় ৩ লক্ষ জনকে। অন্যান্য দেশ তো বাদই রইল।

- **নতুন ভাবে জেগে উঠা: রেঁনেসা**

যাজকদের অনৈতিকতা, শতাব্দীর পর শতাব্দী ডাইনি নিধন, চার্চ সমর্থিত বিভীষিকাময় অত্যাচার এইসব কিছুর ফলাফল ছিল রেঁনেসা। রেনেসাঁ শব্দটি ফরাসি ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ **"পুনর্জন্ম"**। রেনেসাঁ বা নবজাগরণ (আধুনিকতার সূচনা)

১৪৫৩ সাল থেকে সাধারণত রেনেসাঁর সূচনা ধরা হয়। মাঝখানে এক দীর্ঘ সময় গ্রিক দর্শন ছিল খ্রিষ্টান ধর্মের অধীনে। তাদের মতে, যেহেতু গ্রিক ও রোমান সভ্যতার পতনের পর ইউরোপের মেধায় পচন ধরেছিল এবং ১৫শ শতাব্দীতে এসে সেই মেধা আবার সচল ও সজীব হয়ে উঠেছিল; তাই এই যুগকে তারা রেনেসাঁর যুগ বলে।" ১৫শ শতাব্দীতে এসে আবার গ্রিক সভ্যতা প্রাধান্য পেতে থাকল ধর্মের উপর। মানুষের মন-মস্তিষ্ক থেকে ধর্মীয় চেতনা একেবারে বিলুপ্ত হতে লাগল। এক নতুন রূপে মানববাদের চর্চা শুরু হলো, যা মূলত ছিল মধ্যযুগে খ্রিষ্টধর্মকে ত্যাগ করার নামান্তর। মানুষ কথিত ব্যক্তিসত্তাবোধ চিনতে লাগল এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন হওয়ার জোয়ার শুরু হলো। এই আন্দোলনের সুবাদে পরবর্তীকালে ধর্মহীনতা এবং মানববাদের এমন যুগ এলো যে, মানুষ নিজেকে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবতে লাগলো। এই আন্দোলনের মূল চেতনা গুলো হলো :

- এই বিশ্বের কেন্দ্রবস্তু মানুষ নিজে [সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই]। মানুষের জ্ঞান, মানুষের অর্জন, মানুষের জীবনই সত্য।

- মানবতার মর্যাদা : বিশ্বাসের অনুতাপে পুড়ে নাজাতের মাঝে মর্যাদা নেই (খ্রিষ্টবাদের চেতনা); বরং সংগ্রাম ও প্রকৃতিকে জয় করাতেই মানুষের মর্যাদা।

- মনের ওপর জেঁকে বসা ভিনদেশী মতবাদের (খ্রিষ্টবাদ) শেকল ভেঙে মুক্তচিন্তা ও সমালোচনা।

সাহিত্য, কবিতা, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য ইত্যাদির মাধ্যমে এই চেতনাগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হতে লাগল। অনেক ইতিহাসবিদ রেনেসাঁকে ir-religion বা un-christianizing বলেছেন। ১৪৩৬ সালের দিকে গুটেনবার্গ আবিষ্কার করেন ছাপাখানা। যার ফলে রেনেসাঁর চেতনা ছড়িয়ে যায়। নাটক-সাহিত্য-কবিতা-চিত্রকর্মের মাধ্যমে ব্যাপকতা লাভ করে। বাইবেলও ব্যাপক মুদ্রণের ফলে হাতে হাতে পৌঁছে যায়। একসময় চার্চই বাইবেল ব্যাখ্যার অধিকার রাখত। ক্যাথলিকদের বহু ব্যাখ্যা প্রশ্নবিদ্ধ হতে লাগল শিক্ষিত মানুষের কাছে। যা পরবর্তী সময়ে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের বীজ বপন করে।

- **রিফোর্মেশন আন্দোলন**

Reformation Movement ১৬শ শতকে ইউরোপে ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব এবং এর অনুশাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। এই আন্দোলন প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের প্রতিষ্ঠার সূচনা করে এবং ইউরোপীয় সমাজে গভীর প্রভাব ফেলে।
রিফোর্মেশন আন্দোলন শুরু হওয়ার পেছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল:

- চার্চের দুর্নীতি এবং অসঙ্গতি
- ধর্মীয় নেতৃত্বের কর্তৃত্ববাদ
- শিক্ষার প্রসার এবং মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার
- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং মানবতাবাদের প্রভাব

মার্টিন লুথার এবং রিফোর্মেশন আন্দোলন:

রিফোর্মেশন আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন জার্মান ধর্মতাত্ত্বিক **মার্টিন লুথার (Martin Luther)**।

- ১৫১৭ সালে তিনি **৯৫টি প্রস্তাবনা** (95 Theses) প্রকাশ করেন, যেখানে indulgences বিক্রির সমালোচনা এবং চার্চের অনৈতিক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বক্তব্য তুলে ধরা হয়।
- তার মতে, মানুষ সরাসরি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতে পারে; পোপ বা চার্চের মধ্যস্থতা প্রয়োজন নেই।
- লুথার বলেন, বাইবেলই একমাত্র ধর্মীয় কর্তৃত্ব, এবং প্রতিটি মানুষ নিজেই বাইবেল পড়ার অধিকার রাখে।

লুথারের মতবাদ:

- "Faith Alone" **(বিশ্বাসই যথেষ্ট):** তিনি বলেছিলেন, পাপের মুক্তি পাওয়ার জন্য কেবল বিশ্বাসই যথেষ্ট, চার্চের আচার-অনুষ্ঠান নয়।
- "Scripture Alone" **(বাইবেলই সর্বোচ্চ):** বাইবেলের নির্দেশনাই একমাত্র ধর্মীয় গাইডলাইন।

- **এনলাইটেনমেন্ট**

১৭শ শতক থেকে ইউরোপে শুরু হলো বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন- এনলাইটেনমেন্ট। যার শেকড় হলো রেনেসাঁ। এনলাইটেনমেন্ট (আলোকায়ন) রেনেসাঁর হিউম্যানিজম বা মানবকেন্দ্রিকতারই পরিণত রূপ। এর মূল বৈশিষ্ট্য ৩টি-

- *ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (individualism):* আগের সমাজ কাঠামোয় এক স্তর আরেক স্তরকে নিয়ন্ত্রণ করত (social hierarchy)। যেমন রাজা জমিদারদেরকে, আর জমিদারেরা কৃষক-ব্যবসায়ীদেরকে, মালিকের, দাসদেরকে, স্বামীরা স্ত্রীদেরকে। এখন বলা হচ্ছে: না, সবাই সমান, কেউ কাউকে নিয়ন্ত্রণ করবে না। স্বাধীনতা ও সমতা জন্মগত অধিকার।

- *সংশয়বাদ (skepticism):* বিনা প্রশ্নে কিছু মেনে নেওয়া হবে না। খ্রিষ্টবাদকে বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়ে চার্চের হাতে ইউরোপ অনেক ভুগেছে। আর নয়, পুরোনো সকল ধ্যানধারণাকে প্রশ্ন করা হবে, সন্দেহ করা হবে। আগে ভুল ধরে নিয়ে যুক্তিতর্ক শুরু করা হবে।

- *যুক্তি (reason):* যুক্তিতে না ধরলে তা মেনে নেওয়া হবে না। যুক্তিসংগত হতে হবে। যুক্তিগ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলে হাওয়ার ওপর কারো দাবি, কোনো অলৌকিকতা মেনে নেওয়া হবে না।

এই তিন খুঁটিকে সামনে নিয়ে পেছনের অভিজ্ঞতা থেকে এসময়ের দার্শনিকগণ যেসব আইডিয়া তৈরি করলেন, মোটাদাগে সেগুলো এমন-

■ স্বর্গীয় জ্ঞানের ওপর মানবজ্ঞান-যুক্তির সার্বভৌমত্ব

■ কর্তৃপক্ষ ও ক্ষমতার বৈধতার উৎস কী বা কে? (ঈশ্বর যাকে মনোনীত করেছে সে? যেমন রাজা বা পোপ? নাকি মানুষ যাকে মনোনীত করবে সে? অর্থাৎ গণতন্ত্র)

■ জ্ঞানের প্রধান উৎস ওহি নয়, বরং ইন্দ্রিয়। [বিজ্ঞান]

■ পার্থিব কল্যাণ বা সুখই আরাধ্য, কোনো নাজাত মানবজীবনের সার্থকতা নয়।

■ রাষ্ট্র ও চার্চকে আলাদা রাখতে হবে। রাষ্ট্রীয়-অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে চার্চ হস্তক্ষেপ করবে না। [সব জায়গায় ধর্ম টেনে আনবেন না]

■ উন্নত নৈতিকতা যেমন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের (hierarchy) বদলে ব্যক্তিস্বাধীনতা, যুদ্ধের বদলে ভ্রাতৃত্ব-সহিষ্ণুতা, মানবকেন্দ্রিক মানবজ্ঞানভিত্তিক প্রগতি, বংশীয় সাম্রাজ্যের বদলে সাংবিধানিক সরকার, সামাজিক পদক্রমের বদলে সমতাভিত্তিক সমাজ ইত্যাদি।

■ প্রকৃতিকে আর ভয় নয়। প্রকৃতির কিছু নিয়ম রয়েছে, সেগুলো জানা যাচ্ছে (নিউটনের কাজ থেকে এই ধারণা জন্মালো)। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোর বস্তুগত কারণ খুঁজে বের করে আমরা কমন প্যাটার্ন বের করব। সেই মূলসূত্রগুলো ব্যবহার করে আমরাই প্রকৃতিকে ব্যবহার করব। মানুষের সর্বোচ্চ কল্যাণে ব্যবহৃত হবে প্রাকৃতিক শক্তি।

আলোকায়নের ঠিক আগের জনকদের মাঝে আছেন ফ্রান্সিস বেকন, থমাস হবস এবং রেনে দেকার্ত। আর বিজ্ঞানী-দার্শনিকদের মাঝে আছেন গ্যালিলিও, কেপলার, লিবনিয প্রমুখ। রেনেসাঁর শুরুটা ইতালিতে হলেও এনলাইটেনমেন্টের শুরু কিন্তু ইংল্যান্ডে। ৩ ভাগে ভাগ করা হয় এই যুগকে-

> Early Enlightenment (1685-1730)
> High Enlightenment (1730-1780)
>Late Enlightenment (1790-1815)

- আধুনিকতা

আধুনিকতার শুরুটা যে ঠিক কখন, সে ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। কেউ বলেন সেই রেনেসাঁর সময়ই আধুনিকতার যুগ শুরু হয়ে গেছে। কেউ বলছেন ১৭শ-১৮শ শতকের এনলাইটেনমেন্ট থেকেই আধুনিকতার শুরু। কেউ আরো বলছেন আধুনিক যুদ্ধের (দুটো বিশ্বযুদ্ধ) সময়টাই মডার্নিটি। সাধারণভাবে ১৯শ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের শুরুকে (১৮৭০-১৯৩০) মডার্নিটি ধরা হয়।

মডার্নিজম বা আধুনিক চিন্তার বিশিষ্ট দিকগুলো হলো-

১. রাষ্ট্রনীতিতে

- রাজতন্ত্রের বদলে গণতন্ত্রের জনপ্রিয়তা
- সাংবিধানিক ক্ষমতা ভাগাভাগি (আইনসভা, বিচারবিভাগ, নির্বাহী বিভাগ)
- যুদ্ধ-সংঘর্ষের বদলে ফর্মাল রাজনৈতিক সংগ্রাম) ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা
- জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থা

২. অর্থব্যবস্থায়

- জটিল অর্থনীতি
- কৃষির বদলে বৃহৎ শিল্পায়ন
- মার্কেট ইকোনমি
- অর্থনীতির বৈশ্বিক রূপ (economic globalization)
- ব্যাপক শহরায়ণ ও শহরে বসবাসে আগ্রহ

- পুঁজিবাদ ও অধিক ভোগের মানসিকতা

৩. বিশ্বাসগত

- দুনিয়ার প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি যে, মানব প্রচেষ্টা (বিজ্ঞান-প্রযুক্তি) দিয়ে দুনিয়া বদলে দেওয়া সম্ভব। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে দুনিয়াকে আরো ভোগ্য করা সম্ভব।
- প্রগতিতে (constant progress) বিশ্বাস। গতকালের চেয়ে আজ মানবজাতি যেকোনো দিক দিয়েই (প্রযুক্তি, রাজনীতি ও নৈতিকতায়) আরো বেশি উন্নত। আমরা এভাবে উন্নত হতেই থাকব।
- ধর্মীয় সবকিছুর সত্যতা অস্বীকার। সত্যের মাপকাঠি হিসেবে ওহি এবং ওহির ব্যাখ্যাদাতাদের কর্তৃত্ব বাতিল। মানুষের নিজ নিজ বিচারবুদ্ধিই সত্যের পথ।
- নতুন যা কিছু, পুরোনোর চেয়ে (ধর্ম) তা কল্যাণকর।

৪. ব্যক্তি পর্যায়ে

- গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন ও শক্তিশালী সমাজের বিপরীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা
- আগের কমন নৈতিকতা ও মূল্যবোধ (ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক) থেকে সরে আসা
- মানুষে-মানুষে এবং মানবসমাজে বিচ্ছিন্নতা বেড়ে যাওয়া

৫. জ্ঞানগত

- যা ইন্দ্রিয় দ্বারা বোঝা যাবে, তাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য তথ্য। অতীন্দ্রিয় বা মেটাফিজিক্যাল কোনোকিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষের জ্ঞানের ক্রমবর্ধমান উন্নতির ফলে একসময় ধর্ম হারিয়ে যাবে; দর্শন ও অপরাপর মানবিক জ্ঞান ক্রমেই বস্তুবাদী হয়ে উঠবে এবং পুরো মানবজ্ঞানই বিজ্ঞানের অধীনে চলে আসবে।

- ২ ধরনের কথার অর্থ হয়- যুক্তি-বিশ্লেষণ (analytical statement) আর। পর্যবেক্ষণলব্ধ (empirical statement); এই ছকের বাইরে বাকি সব অনর্থক।

ইসলামি সভ্যতার ইতিবৃত্ত

বর্তমান বিশ্বে নির্যাতিত ও নিপীড়িত মুসলিম জাতির রয়েছে সোনালি অতীত, আছে গৌরবময় ইতিহাস। একসময় মুসলমানরাই ছিল বিশ্বে পরাশক্তির অধিকারী। গোটা পৃথিবীই ছিল তাদের ভয়ে কম্পমান। তাদেরকে চোখ রাঙানি দেওয়ার মতো সাহস কারও ছিল না। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ সর্বত্রই ছিল তাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মুসলিম বাহিনী এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। মুসা বিন নুসাইর বাইজেন্টাইনদের পরাজিত করে মরক্কো, তাজিয়ার- সহ প্রায় সমগ্র আফ্রিকাতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে মাত্র ১২ হাজার মুসলিম সৈন্য রডারিকের ১ লাখের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে আন্দালুস (স্পেন, পর্তুগাল) জয়

করে এবং মুসলমানরা সেখানে প্রায় ৮০০ বছর শাসন করে। তৎকালীন কর্ডোভার শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, সভ্যতা, ও ঐশ্বর্যের দ্যুতি যখন চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল তখন বর্তমান জ্ঞানগর্বিত ও সভ্যতাপ্রদীপ্ত ইংরেজ, ফরাসি ও জার্মানদের পূর্বপুরুষগণ কুসংস্কার, জঞ্জাল ও অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মুসলমানরাই ভারত উপমহাদেশ শাসন করে।

চতুর্দশ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানরা উসমানি সাম্রাজ্যের অধীনে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বেশিরভাগ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করত। প্রায় ৫২ লাখ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত সেই সাম্রাজ্যে পৃথিবীর বর্তমান মানচিত্রে প্রায় ৪২টি দেশের অবস্থান। সেই সময় তাদের প্রভাব এত বেশি ছিল যে, বর্তমান সুপার পাওয়ার আমেরিকা ১৭৯৫ সালে উসমানি বাহিনী কর্তৃক আলজেরিয়ার উপকূলে আটককৃত নাবিক ও জাহাজসমূহ ফেরত লাভ এবং আটলান্টিক ও ভূমধ্য সাগরে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য উসমানি খেলাফতকে মোটা অঙ্কের এককালীন নগদ ও বার্ষিক কর প্রদানের শর্তে চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিল।

সমৃদ্ধ এই সভ্যতার মূল ভিত্তি ইসলাম ধর্ম। ইসলাম ধর্মই জাহেলিয়াতের যাতা কলে পিষ্ট দুনিয়াকে চিনিয়ে ছিল কিভাবে সভ্য হতে হয়। পৃথিবীর মানুষ নতুন করে পরিচিত হয়েছিল ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার সাথে। নারীরা তাদের প্রাপ্য সম্মান লাভ করেছে ইসলামের দরুণ। নাজাত ও আধ্যাত্মিকতার নতুন ধারণা নিয়ে আসে ইসলাম। এইসব কিছুর সম্বনয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের বার্তা। দ্রুততম সময়ে গড়ে উঠে একটি নিরেট সভ্যতা।

- **ইসলামের সূর্যোদয় : নবুওয়াত প্রাপ্তি**

ইসলাম ধর্মের প্রচারক সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব, মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ (সা:)। তিনি মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জাহিলিয়াতের সেই যুগে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম একজন মানুষ। তাঁর গুণে মুগ্ধ হতে বাধ্য ছিল যে-কোন আরব অনারব।

পরিণত বয়সে সুগভীর প্রজ্ঞা সম্পন্ন এই মহামানব পৃথিবীর এই দুর্বস্থায় চিন্তিত হয়ে নির্জনতায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। তাঁর চিন্তার জগতে ঘুরপাক খেতো কিভাবে মানুষ মুক্তি পাবে জাহেলিয়াতে এই শিকল থেকে।

অবশেষে সৃষ্টিজগতের রব আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা নবীজিকে সম্মানিত করতে চাইলেন এবং তাঁর মাধ্যমে বান্দাদের প্রতি দয়া করতে চাইলেন। ইতোমধ্যে আল্লাহ তাআলা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়ত ও ওহি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে নেন। সত্যস্বপ্নের মাধ্যমে প্রথম ওহির ধারা আরম্ভ হয়। ঐশী কালাম গ্রহণের এটিই ছিল সূচনা পদক্ষেপ। তারপর সরাসরি ওহি অবতীর্ণ হয়।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতে প্রথম ঈমান আনেন তাঁর স্ত্রী খাদিজা রাযি.। তারপর ধীরে ধীরে দাওয়াত ছড়াতে থাকে। মক্কার অল্পকিছু সদস্য নতুন ধর্মে প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে একজন হলেন আলি ইবনে আবি তালিব রাযি.। আলি রাযি. তখনো বেশ ছোট ছিলেন। বয়স ১০ পেরোয়নি।

অন্যরা হলেন-আবু বকর সিদ্দিক, নবীজির আজাদকৃত গোলাম যায়েদ ইবনে হারিসা, উসমান ইবনে আফফান, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আবদুর রহমান ইবনে আউফ ও সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.। (৮০)

একইভাবে নারীদের মধ্যেও ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো-যারা ঈমান এনেছেন, তারা ছিলেন বিভিন্ন শ্রেণি ও বয়সের। অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র ও দুর্বল। কারণ, তারা ইসলামের প্রাথমিক বিষয়াদিকে মানবিক ফিতরাতের কাছাকাছি দেখে আগ্রহ নিয়ে দ্বীন গ্রহণে এগিয়ে এসেছেন। এগুলো তাদের অন্তরে আশার সঞ্চার করে। কারণ, **ইসলাম সমতার দাওয়াত দেয়। দাসদেরকে স্বাধীনতার অধিকার দিতে বলে। প্রয়োজনগ্রস্তকে সহযোগিতা করতে বলে।**

- **মক্কার দাওয়াতি কার্যক্রম :**

ইসলামি দাওয়াতের শুরুর দিকের বাধাগুলো বোঝার জন্য মুসলিমদের প্রথম প্রজন্মকে সামাজিক অবস্থান হিসেবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

- প্রথম দলে আছেন-**ধনী পরিবারের তরুণ ও নওজোয়ান সন্তানেরা**, যাদের পরিবার মক্কার সমাজে বিশাল সম্মান পেয়ে অভ্যস্ত। এই দলের সর্বোত্তম উদাহরণ হলেন, খালিদ ইবনে সাইদ ইবনুল আস রাযি.। এই পরিবারগুলো তাদের গোষ্ঠীর মর্যাদা নিরুপণের ক্ষেত্রে সমাজে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ছিল। এখানে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, যেসব লোক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতার নেতৃত্ব দিয়েছে, তারা সবাই এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

- দ্বিতীয় দলে আছেন, অন্যান্য পরিবারের সন্তানেরা। যাদের বংশধারা দুর্বল গোষ্ঠীগুলোর দিকে সম্পৃক্ত। যেমন: বনু হারিস ইবনে ফিহর, বনু উমাইর। এই দুই দলের মধ্যে বড় কোনো পার্থক্য পাওয়া যায় না।

- তৃতীয় দলে আছেন, ওইসব লোক, যারা মক্কার সমাজের কোনো গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত নন। তারা গোত্রীয় নিয়মের আওতার বাইরে। নামকাওয়াস্তে কোনো কোনো গোষ্ঠীর দিকে নিজেদের সম্পৃক্ত করে থাকেন। এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন 'মুস্তাজআফিন' বা দুর্বল শ্রেণি। যেমন: সুহাইব রুমি, আম্মার ইবনে ইয়াসির, বেলাল হাবশি প্রমুখ রাযি,।

তিন বছর পর্যন্ত দাওয়াতের কাজ গোপন ছিল। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেন। তখন তাঁর কওম শত্রুতে পরিণত হয়। তারা তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর ইসলাম গ্রহণকারী অনুসারীদের নির্যাতন করে। তিনি নিজেও

হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হন। সন্দেহ নেই-মক্কায় ইসলামের দাওয়াতের সূচনা কুরাইশদের উদ্‌দ্বিগ্ন করে তুলেছিল। এমনকি তারা সার্বক্ষণিক অস্থিরতায় ভুগত। তারা তাদের বাণিজ্যিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক সব ধরনের স্বার্থের বিষয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুসারীদের নির্যাতিত হতে দেখলেন। সে সময় তাঁর পক্ষে অনুসারীদের সহযোগিতা করা সম্ভব ছিল না। তাই ফেতনার আশঙ্কায় তাদের হাবশায় হিজরত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

এদিকে মক্কায় মুসলিমদের বলয় শক্তিশালী হতে শুরু করে। উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি, নতুন ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করার মাধ্যমে মুসলিমরা শক্তি লাভ করে। উমর ছিলেন দৃঢ়চরিত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটিও ঘটেছিল উপযুক্ত সময়ে। তিনি যে তেজ নিয়ে ইসলামের বিরোধিতা করেছিলেন, সেই তেজ ইসলামের সেবায় প্রকাশ করেন।

বনু হাশিম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিবৃত্ত না করায় কুরাইশরা তাদের ভর্ৎসনা করে। তারপর কুরাইশের গণ্যমান্য ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাদের আর্থ-সামাজিক বয়কট ও অবরোধের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়। এই অবরোধ দুই বছরের বেশি সময় ধরে বহাল থাকে।

কিন্তু এই অবরোধ মক্কার ইসলামবিরোধী লোকদের পক্ষে ইতিবাচক কোনো ফলাফল বয়ে আনেনি। অবরোধের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের মৌসুমে মক্কায় আগমনকারী বিভিন্ন গোত্রকে উঁচু মনোবল নিয়ে দাওয়াত দিতেন।

মক্কি দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য :

কুরআনুল কারিম মক্কি সুরাগুলোতে আকিদাগত বিশৃঙ্খলার প্রতিকার বিধান করেছে। কেননা, আকিদা হলো একটি নতুন ধর্মের প্রধান বিষয়। মৌলিক আকিদা হিসেবে যেগুলো সামনে আসে তা হলো-প্রভুত্ব, দাসত্ব এবং এ দুয়ের মধ্যকার সম্পর্ক। কারণ,

পৌত্তলিকতাকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই সেখানে। দিনের পর দিন তা বাড়তেই থাকবে। সুতরাং প্রতিমাপূজা ও বহু উপাস্য-ধারণা ও বিশ্বাসকে শক্তভাবে প্রতিহত করতে হবে। মক্কি সুরার আয়াতগুলো নাজিল হয়ে প্রথমে পৌত্তলিকতা ও তা নির্মূলের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে এবং এর পরপর বহু উপাস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। একই সঙ্গে এই সময়ের আয়াতগুলো খালেক ও কাহহার আল্লাহর জন্য একত্ববাদ সাব্যস্ত করে।

মক্কার দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিল আখেরাতের পুনরুত্থান এবং প্রতিদানের আকিদা। পুনরুত্থান হলো পুনরায় পূর্বের জীবন দান। আর প্রতিদান হলো প্রথম জীবনের আবশ্যকীয় ফলাফল। মক্কার কিছু লোক পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করত-যেদিন আল্লাহ তাআলা বান্দাদের নতুন করে জীবন দান করবেন। তখন কুরআন শেষ দিবসের বাস্তবতা প্রমাণ করে যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মের প্রতিদান লাভ করবে। জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে কুরআন কাফিরদের দৃষ্টিভঙ্গি বাতিল প্রতিপন্ন করেছে।

মক্কায় নাজিলকৃত কুরআনের আয়াতগুলো ইবাদতকে চিত্রিত করেছে এভাবে-এমন এক আমল, যা মাখলুককে খালেকের সঙ্গে জুড়ে দেয়। বান্দাকে ভালো কাজের দিকে ফেরায়।

আকিদা সংশোধনের ফাঁকে ফাঁকে মক্কি আয়াতগুলো ভালো আমল ও স্বভাব বলে দিয়েছে, যেগুলো বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য পাইয়ে দেবে। আখলাক, মানুষের সাথে মুয়ামালাত, পারস্পরিক সহমর্মিতা, যথাসম্ভব অন্যকে ক্ষমা করে দেওয়া, নিজে সংশোধিত হওয়া, ধৈর্যধারণ করা এবং স্বেচ্ছাচারিতা ও হঠকারিতার মতো জঘন্য কুপ্রবৃত্তিকে পরাজিত করা-অধিকাংশ আয়াত ঘুরে ফিরে এই বিষয়গুলোর কথাই বলেছে।

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৩ বছর মক্কায় শ্রম ব্যয় করেছেন দুটি উদ্দেশ্যে। মক্কার উর্বর জমিনে এই আকিদার চাষাবাদ করতে এবং মানুষের সমঝদারি ও বোধবুদ্ধি থেকে ভুল বোঝাপড়া দূরীভূত করতে।

- **হিজরত :**

অবশেষে এলো প্রতীক্ষিত সময়। পাওয়া গেল ইসলামি আকিদা বিকশিত হবার উর্বর পলিমাটি। ইয়াসরিবের (মদিনা) সমাজ তখন এক ভঙ্গুর অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। যুদ্ধের আগুন তাদের তছনছ করে দিয়েছে। গোত্রের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও অস্থির অবস্থা তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে না। এজন্য প্রয়োজন আকিদা, বোঝাপড়া, গঠনপ্রক্রিয়া ও জীবনধারণ- সবকিছুর মৌলনীতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করা। দীর্ঘকাল ইয়াসরিব এই পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় ছিল। অবশেষে তা খুঁজে পায় ইসলামের দাওয়াতের নীতিমালায়। যার দরুন, কোনো সংশয় ছাড়াই ইয়াসরিব সাড়া দেয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে।

আরবের এই সমাজটি আউস ও খাযরাজ দুটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। মূলত তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অপরদিকে ইহুদিরা বড় বড় তিনটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। বনু কাইনুকা, বনু নাযির ও বনু কুরাইযা। আরও কিছু অপ্রধান গোত্র ছিল। সন্দেহ নেই-এই জাতি ভিন্নতা ইসলামি আকিদা প্রচারের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে ইহুদি জাতি তাদের মজ্জাগত চরিত্র অনুযায়ী নিজেদের দখল পোক্ত করার জন্য আরবদের মধ্যে বিভক্তি তৈরির রাজনীতি বেছে নিয়েছিল।

ইয়াসরিবে আউস ও খাযরাজের মধ্যে ইসলাম প্রসার লাভ করে দুই বাইআতুল আকাবার পর।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুসারীদের সেখানে হিজরতের পরামর্শ দেন। তারপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে হিজরতের অনুমতি দেন। নবীজি আবু বকর রাযি.-কে সঙ্গে নিয়ে ইয়াসরিবের উদ্দেশে রওনা দেন। সেখানে পৌঁছেন সোমবারে (রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ/৬২২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ২৫ তারিখ)। মুসলিমদের আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে নবীজি ইয়াসরিবে প্রবেশ করেন। ১৮৮১ ইয়াসরিবের নাম বদলে নতুন নাম হয়- মদিনাতু রাসুলিল্লাহ বা মদিনা মুনাওয়ারা।

ইয়াসরিবে তাঁর হিজরতের আগের ও পরের দুটি যুগের মধ্যে ব্যবধান তৈরি করে দিয়েছে। প্রত্যেক যুগের আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে। যুগের সেই বৈশিষ্ট্যের সাথে সংগতি রেখে দাওয়াতের পন্থা ও বিধান প্রণীত হয়ে থাকে। মক্কি যুগ শেষ হবার পর হিজরত ছিল ইসলামের এক নতুন যুগের সূচনা। যেখানে কর্মপন্থা, শাসনব্যবস্থা, শরিয়ত বা বিধান প্রবর্তন এবং লক্ষ্য ঠিক রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ-সবকিছু নতুন ধরনের, আলাদা বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত।

- **ইসলামি রাষ্ট্র বিনির্মাণ :**

মদিনায় আগমনের সময় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু শক্তিশালী অনুসারী তৈরি হয়। পাশাপাশি অনুসারীদের মধ্যে তাঁর একটি রাজনৈতিক অবস্থান তৈরি হয়। নবীজির মক্কার অনুসারীদের বলা হয় মুহাজির এবং মদিনাবাসী অনুসারীদের বলা হয় আনসার। ইসলামের বন্ধনের ভিত্তিতে নবীজি তাদের ঐক্যবদ্ধ করার পদক্ষেপ নেন।

প্রথমে আউস ও খাযরাজের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন করেন। তাদের মনের ভেতর পুষে রাখা পুরোনো সব শত্রুতা দূর করেন। তারপর আনসার নামের অধীনে তাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে

তোলেন। যারা নবীজিকে সাহায্য করেছে, ইসলামের দাওয়াতকে শক্তিশালী করেছে-তারাই আনসার। মুহাজিরদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করার জন্য মুহাজির-আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করার প্রতি মনোযোগ দেন। তারপর সকল মুসলিমের মধ্যে অধিকার, সমতা ও মৃত্যুর পর একে অপরের মিরাস পাবে-এই মর্মে ভাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে দেন। এই বন্ধন এতটাই দৃঢ় ছিল যে, ইসলামি ভ্রাতৃত্বের প্রভাব এ ক্ষেত্রে রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়ের চেয়ে বেশি ছিল।

ইসলামি সমাজগঠন ও ইসলামি রাষ্ট্রনির্মাণের ক্ষেত্রে এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল দ্বিতীয় মৌলিক পদক্ষেপ, যার ওপর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ভর করেছিলেন। কারণ, যেকোনো রাষ্ট্রের উত্থান ও গঠন জাতির ঐক্যের ভিত ছাড়া সম্ভব হয় না।

যে-সকল অমুসলিমকে নিয়ে মাদানিসমাজ গঠিত হবে, তাদের ও মুসলিমদের মধ্যে একটি চুক্তিনামা লেখা হয়। নতুন রাষ্ট্রের সাংবিধানিক মূল্য বিচারে এটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মদিনায় আগমনের পর প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে নবীজি একটি নতুন শৃঙ্খলাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতি মনোযোগ দেন। যা মদিনায় অবস্থানকারী মুসলিম, ইহুদি, মুশরিক সকলকে ঐক্যের ছায়াতলে একত্র করবে। নবীজি তাঁর কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র ও মদিনাবাসীদের মধ্যকার সম্পর্কের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেন। সেই রূপরেখাটিকে মৌল নীতিমালার মর্যাদা দেন। যার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী সময়ে সাংগঠনিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নীতিমালা-সহ ইসলামি রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তো, নবীজি মদিনাবাসীকে এক দৃঢ় প্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করেন। যে-বন্ধন নির্দিষ্ট সীমারেখার আওতায় প্রত্যেক নাগরিকের আকিদা ও আমলের স্বাধীনতা প্রদান করবে। সিরাতবিদ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক এই চুক্তিপত্রের মূলভাষ্য উল্লেখ করেছেন।

চুক্তিপত্রের ভাষ্যটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

- এক, মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী হবে তা নির্ধারণ করে দেন। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাতি ও গোত্রের ভেদাভেদ সত্ত্বেও সকল মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হন। তিনি ইসলামের বন্ধনের ভিত্তিতে তাদের সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ গঠন করেন।

- দুই, মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্কের ধরন কী হবে-তা নির্ধারণ করে দেন। বাস্তবতা হালা, উক্ত চুক্তিনামা সংখ্যালঘুতার দিকে লক্ষ করে তাদের অধিকারগুলো বিস্তারিত আকারে ব্যাখ্যা করে দেয়নি। অন্যান্য দলকে যেমন নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বহাল রাখার অনুমতি দিয়েছে, তাদেরও তা-ই দিয়েছে।

- তিন, ইহুদিদের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হবে-তাও নির্ধারণ করে দেন। ইহুদিদের সাথে চুক্তিনামায় ছিল সন্ধি ও শান্তিস্থাপন করতে হবে। জনস্বার্থের সীমারেখার মধ্যে থেকে স্বাধীনভাবে ধর্মকর্ম পালন করতে পারবে। পাশাপাশি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব মেনে নিতে হবে। কুরাইশদের বিরুদ্ধবাদিতা প্রতিহত করে মদীনা রক্ষা করা হবে। মদীনায় আক্রমণকারী কোনো গোষ্ঠী ও শক্তিকে সহযোগিতা করা যাবে না। অথবা নবীজির অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধবাজ মুশরিকদের সাথে মিত্রচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া যাবে না। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে।

চুক্তিনামা লেখা শেষ হওয়ার পর সকলে এর বিষয়বস্তুর ব্যাপারে একমত হয়। সব দল এতে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিনামার বিষয় বাস্তবায়নে কাজ করবে এই মর্মে মদিনাবাসীরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এর মাধ্যমে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধর্মীয় ও বিচার-বিভাগীয় কর্তৃত্ব নিজ অধিকারে সংরক্ষিত রাখেন। রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্ব মদিনাবাসী সকলের হাতে ন্যস্ত করেন। চুক্তিনামার ধারাগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেকে বিচারক এবং কেন্দ্রস্থল মনোনীত করেন। এইভাবে অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো সমাধা করার পরে তিনি বাইরের বিষয়ের দিকে পুরোপুরি মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ পান।

- **উল্লেখযোগ্য কিছু সারিয়্যা ও গাযওয়া :**

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় হিজরত ছিল কুরাইশদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। মক্কার ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য শ্রেণি আশঙ্কা করছিল- মদিনার বাঁক পেরোবার সময় কুরাইশদের বাণিজ্য-কাফেলাকে ধাওয়া করতে তিনি তাঁর অনুসারী বাহিনী পাঠাতে পারেন। তারা নিজেদের লুণ্ঠিত সম্পদ এবং হিজরতের সময় ফেলে আসা সম্পদের বদলা চাইবে। এই তৎপরতা বাস্তবায়ন হলে কুরাইশদের বাণিজ্যিক খাতে এক বড় ধরনের বিপর্যয় নেমে আসবে। এজন্য তারা মদিনার বড় বড় ইহুদি ব্যবসায়ী ও ধনীদের কাছে নিরাপত্তা-সহযোগিতা প্রার্থনা করে। শামে যাওয়া-আসা করে এমন কাফেলাগুলো মদিনার মরুপথ অতিক্রমকালে যেন তারা তাদের নিরাপত্তা বিধান করে।

এদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লোকদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছেন। কারণ, ইতোমধ্যেই আল্লাহ তাআলা আকিদা ও প্রাণ রক্ষার জন্য তাঁকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন।

প্রশিক্ষণ এবং মনোবল চাঙ্গা করার মাধ্যমে লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হবার জন্য তাদের প্রস্তুত করছেন যাতে করে সম্মুখ সমরে তারা পরাজিত না হন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের বাগডোর হাতে তুলে নেন। ব্যাবসায়িক কাফেলাকে ধাওয়া করার মাধ্যমে কুরাইশদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। কারণ, ব্যবসা ছিল কুরাইশদের জীবনধারণের প্রধান উপায় এবং তাদের শক্তির মূল উৎস। পাশাপাশি এই তৎপরতার আরেকটি লক্ষ্য ছিল- কুরাইশ ব্যতীত উদীয়মান রাষ্ট্রটির অন্য শত্রুদের সতর্ক করা।

এই বার্তা দেওয়া- মুসলিমরা প্রতিরোধ করতে সক্ষম এবং তারা যেকোনো শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত।

হিজরতের পর প্রথম ১৮ মাসের ভেতরে মুসলিমরা চারটি গাযওয়া এবং তিনটি সারিয়্যা সম্পন্ন করেন।

এর মধ্যে ছয়টি অভিযান প্রেরণ করা হয় বাণিজ্যিক কাফেলা আক্রমণ করার জন্য। তুলনামূলকভাবে এগুলোর ফলাফল ছিল সীমিত। এই অভিযানগুলো মদিনার প্রতিবেশী বেদুইন গোত্রগুলোকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। তারা মুসলিমদের সঙ্গে সন্ধি করতে উৎসাহিত হয়। অপরদিকে মুসলিমদের এই ধরনের সামরিক অভিযানগুলো সফল হবার জন্য এই বেদুইনদের সহযোগিতা জরুরি ছিল।

প্রথমে সশস্ত্র মোকাবেলা হয় আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ রাযি.-এর নেতৃত্বে প্রেরিত নয় সদস্যের মুসলিম বাহিনী এবং মক্কার এক ব্যবসায়ী কাফেলার মধ্যে। আমর ইবনুল হাজরামির নেতৃত্বে চলা সেই কাফেলাটিতে লোকসংখ্যা ছিল চারজন। লড়াই সংঘটিত হয় নাখলায়। এই লড়াইয়ের ফলাফল দাঁড়ায় কাফেলা প্রধান নিহত হয়, দুইজন বন্দি হয় এবং আরেকজন পালিয়ে যায়।

মূল ঘটনা হলো, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ রাযি.-কে পাঠান বাণিজ্যিক কাফেলার খোঁজখবর নিতে। তিনি লড়াই চাননি। কেননা, তিনি বেরিয়েছিলেন রজব মাসে, যেটি হারাম মাস। কিন্তু ইবনে জাহশ ইজতেহাদ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কাফেলার ওপর হামলা করেন। মদিনায় ফিরে এলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অভিযানে প্রাপ্ত গনিমত বণ্টনের দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তিনি তাঁর ভাগের পঞ্চমাংশও গ্রহণ করেননি। অবশেষে আবদুল্লাহ ইবনে জাহশের সিদ্ধান্তকে নির্দোষ ঘোষণা করে কুরআনের আয়াত নাজিল হয়। মুসলিমদের প্রতি মক্কাবাসীর সীমালঙ্ঘনের যুক্তিতে এই ধরনের তৎপরতাকে বৈধতা দেওয়া হয়।

➤বদর যুদ্ধ:

প্রথম দিককার গাযওয়া ও সারিয়্যাগুলো কুরাইশদের চোখ-কানের সামনে ঘটে। কিন্তু সেগুলোকে যেন সংজ্ঞায় ফেলতে পারছিল না। হারাম মাসে সংঘটিত নাখলার ঘটনাকে তারা সুযোগ হিসেবে কাজে লাগায়। মুসলিমদের বিরুদ্ধে আরবদের উত্তেজিত করতে এবং মদিনার প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোতে হামলা করতে সুযোগটি লুফে নেয়। এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মুসলিম। ও কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

মক্কাবাসী অদের বাণিজ্যিক কাফেলার প্রহরাব্যবস্থা আরও জোরদার করতে শুরু করে। হিজরতের দ্বিতীয় বছরের মাঝামাধি নবীজি জানতে পারেন, আবু সুফিয়ান ইবান হারবের নেতৃত্বে শাম থেকে মক্কা কুরাইশদের একটী বড় বাণিজ্যিক কাফেলা আসছে। সিদ্ধান্ত নেন কাফেলাট হস্তগত করবেন। তাঁর সঙ্গীরাও এই ডাকে সাড়া দেন। নবীজি ৩১৪ জনের একটি বাহিনী গঠন করতে সক্ষম হন। তারা এতটাই সংকটাপন্ন ছিলেন যে, হামলায় ব্যবহারের জন্য সবমিলিয়ে ২০টির বেশি উট এবং দুটির বেশি ঘোড়া ব্যবস্থা করতে পারেননি। রমজানের আট তারিখ নবীজি মদিনা থেকে রওনা দেন। স্পষ্টত জানা যায়, মুসলিম বাহিনীর রওনা হবার খবর আবু সুফিয়ান খুব দ্রুত জেনে যান। তখন তিনি দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

- সহযোগিতা ও যোদ্ধা চেয়ে মক্কায় দূত পাঠান।
- পথ পরিবর্তন করে ভিন্নপথ গ্রহণ করেন।

কুরাইশরা আবু সুফিয়ানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আবু জাহলের নেতৃত্বে ৯৫০ জন যোদ্ধার এক সামরিক শক্তি পাঠায়। এই শক্তির গুরুত্ব প্রমাণ করে-আবু জাহল মুসলিমদের অন্তরে ভীতি ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিল। মুসলিমনের ভবিষ্যতে কুরাইশের বাণিজ্যকাফেলা ধাওয়া করতে বাধা দিতে চেয়েছিল।

উভয় বাহিনী বদর উপত্যকায় একে অপরের মুখোমুখি হয়। বদর উপত্যকার অবস্থান মদিনার মফিল নিকে ২০ মাইল দূরে। যুদ্ধ সংঘটিত হয় দ্বিতীয় হিজরির ১৭ রমজান খ্রিষ্টীয় ৬২৪ সনের মার্চ মাসে। এই যুদ্ধে মুসলিমরা বিরাট বিজয় লাভ করেন। কুরাইশদের ৭০ জন যোদ্ধা নিহত হয়, যাদের মধ্যে আবু জাহলও ছিল। এ ছাড়া আদের ৭০ জন যোদ্ধা বন্ধি হয়।

এই বিষয় ইসলামের সূচনাকালীন ইতিহাসে ভিত্তিপ্রদর স্থাপন করেছিল। এই যুদ্ধটি ছিল কুরাইশ ও মুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত প্রথম কোনো সশস্ত্র জোরালো সংঘাত। যেখানে সেবাসংখ্যা ও সরঞ্জাম অল্প হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমরা নিঃস্কুশ বিজয় লাভ করেছিল। যুদ্ধশেষে মুসলিমরা বন্দি ও গনিমত নিয়ে মদিনায় ফিরে আসেন। মক্কায় মুসলিমদের তীব্র কষ্ট দিত এমন কয়েকজন বন্দিকে নবী সাল্লাল্লাহ আল্যইাই ওয়াসাল্লাম হত্যা করেন। একই সময়ে অন্য বন্দিদের মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেন। আবু সুফিয়ান বেঁচে যান। মক্কায় ফিরে মুসলিমদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার ঘোষণা দেন।

➤উহুদ যুদ্ধ:

এটি ছিল উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে তৃতীয় হিজরির শাওয়ালের মাঝামাঝি খ্রিষ্টীয় ৬২৫ সনের এপ্রিল মাসে সংঘটিত একটি যুদ্ধ। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের চেতনা থেকে।

কুরাইশ, আহবাশ এবং কিনানা ও তিহামার আরবদের সমন্বয়ে গঠিত ৩ হাজার যোদ্ধার বাহিনীকে নেতৃত্ব দেয় আবু সুফিয়ান। যোদ্ধাদের মনোবল চাঙ্গা করার জন্য মদিনার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার সময় সাথে করে নারী নিয়ে নেয়। উহুদে পৌঁছার আগে তাদের ফিরতে মানা করে। উহুদ হলো মদিনার নিকটবর্তী একটি জায়গা। মদিনার বিপরীতে সুবিশাল উপত্যকায় আবু সুফিয়ান শিবির স্থাপন করে। সম্ভাব্য সব পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্রমবর্ধমান মুসলিমশক্তিকে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য মজবুত এক সামরিক রূপরেখা প্রস্তুত করে।

এদিকে মদিনায় নবীজির বিরোধীদের সাথে তাদের গোপন যোগাযোগ বহাল থাকে। পাশাপাশি লড়াইয়ের জন্য যোদ্ধাদের উদ্‌বুদ্ধ করতে আবু সুফিয়ান উসকানিমূলক কবিতার আশ্রয় নেয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থানকারী তাঁর চাচা আব্বাসের পক্ষ থেকে একটি পত্র পান। পত্রে তিনি কুরাইশ বাহিনীর রওনা সম্পর্কে সংবাদ জানান। পত্র পেয়ে নবীজি তাৎক্ষণিক তাঁর সকল সাহাবিকে নিয়ে পরামর্শ সভা ডাকেন। উপস্থিত সাহাবিরা দুদলে বিভক্ত হয়ে যান। একদলের মত হলো, শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য মদিনা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া। এই দলে ছিলেন লড়াই-উন্মুখ যুবক এবং বদরে অংশগ্রহণ করেননি-এমন সাহাবিরা। আরেকদল মদিনায় অবস্থান গ্রহণের মতকে প্রাধান্য দেন। এতে করে মদিনার প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষা জোরদার করা যাবে। নারী ও শিশুদের সহযোগিতা করা যাবে। এই মত ছিল প্রবীণ সাহাবিদের। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতও এটিই ছিল। মদিনার প্রসিদ্ধ সর্দার এবং মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলও এই মতের পক্ষে ছিল।

কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে গ্রহণ করেন। নিজে যুদ্ধের পোশাক পরে নেন এবং মুসলিমদের ধৈর্যশীল ও অবিচল থাকতে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল তার ৩০০ জন অনুসারী-সহ সরে যাওয়ার পর সর্বসাকুল্যে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৯০০ জন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের এই সরে যাওয়া ছিল মুসলিম বাহিনীকে দুর্বল করার এক নিখুঁত পরিকল্পনামাফিক পদক্ষেপ। উপত্যকার একদম শেষপ্রান্তে উহুদ পাহাড়কে আশ্রয় বানিয়ে মুসলিম বাহিনী শিবির স্থাপন করে। এই কৌশলী তৎপরতার মাধ্যমে নবীজি তাঁর বাহিনীকে মদিনার দিক থেকে আলাদা করে ফেলেন।

কুরাইশের অশ্বারোহী বাহিনী ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশ্চিন্তার মূল কারণ। এর জন্য সতর্কতাস্বরূপ পাহাড়ের বিভিন্ন পয়েন্টে ৫০ জন লোক নিযুক্ত করেন।

তাদের নির্দেশ দেন তারা যেন কুরাইশের অশ্বারোহী বাহিনী কর্তৃক মুসলিমদের ঘেরাও করে ফেলাকে প্রতিরোধ করে।

এবং **যুদ্ধের ফলাফল যা-ই হোক, তারা যেন স্থান ত্যাগ না করে।**

উভয় দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। হুট করে যুদ্ধের মোড় ঘুরে না গেলে মুসলিমদের বিজয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। পাহাড়ের ওপর অবস্থান গ্রহণকারী ইসলামি বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য স্থান ত্যাগ করে চলে আসেন গনিমত সংগ্রহে অংশগ্রহণ করার জন্য। এর মাধ্যমে তারা নবীজির নির্দেশ অমান্য করেন। কুরাইশ বাহিনীর ডানবাহুর সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ এই দায়িত্বহীন পদক্ষেপের সুযোগ কাজে লাগায়। মুসলিমরা তখন গনিমত সংগ্রহে ব্যস্ত। খালিদ বিন ওয়ালিদ তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের পশ্চাদ্ভাগ থেকে ঘেরাও করে ফেলে। এই তাৎক্ষণিক আক্রমণে মুসলিমরা হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। তাদের শৃঙ্খলা ভেঙে যায়। তাকিয়ে দেখে, কুরাইশরা পুনরায় আক্রমণ করেছে। যুদ্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে ঘুরে গেছে। মুসলিমরা নিজেদের আবিষ্কার করে কুরাইশদের তরবারির আঘাতের নিচে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হামযা রাযি. ওয়াহশির হাতে শহিদ হন। ঝাণ্ডা বহনকারী মুসআব ইবনে উমাইর রাযি. শহিদ হন। স্বয়ং নবীজিও আক্রান্ত হন।

এ কথা স্পষ্ট যে, কুরাইশরা এই ফলাফল নিয়েই যুদ্ধ থেকে ফিরে যায়। অথচ তখনো পরিপূর্ণ বিজয় হয়নি। আবু সুফিয়ান বিজয় লাভ করার পূর্বেই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ শেষে মুসলিম বাহিনীর লাশগুলোকে একত্রিত করার নির্দেশ দেন। দেখা গেল, ৭০ জন মুজাহিদ শহিদ হয়েছেন। নবীজি তাদের জানাযা পড়ে দাফন করেন। তারপর মদিনায় ফিরে আসেন ।

বাস্তবতা হলো, এই খেসারত মুসলিমদের শক্তির কোনো ক্ষতি করেনি। সাহাবিদের উঁচু মনোবল তৈরি করার ক্ষেত্রে নবীজির বিশেষ অবদান ছিল। এই যুদ্ধ ছিল তাঁদের দ্বীন আঁকড়ে থাকা এবং অবিচলতার এক পরীক্ষা। সূরা আলে ইমরানের ১২১ থেকে ১৮০ নং

আয়াতের আলোচ্য বিষয় হলো উহুদ যুদ্ধ। আয়াতগুলো উহুদের পর নাজিল হয়। এই আয়াতগুলো সংকটময় পরিস্থিতিতে সতর্কীকরণ, প্রেরণা প্রদান এবং দিকনির্দেশনার কাজ করেছে। আয়াতগুলোতে সেসব ভুল পদক্ষেপ ও অস্থির অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। এর আলোকে তা মুসলিমদের সময়ের পালাবদলে শিক্ষা ও আত্মগঠনের সবক দেয়। এটি ছিল পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের শিক্ষা।

মক্কায় পৌঁছার পূর্বে আবু সুফিয়ান ও মক্কার নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারল-তারা এক জটিল পরিস্থিতিতে আছে। এত পরিশ্রম করেও তারা আসলে কিছুই লাভ করেনি। যদি তারা পূর্বের চেয়ে ভালো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে বিপর্যয় তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের দৃষ্টিতে এর একমাত্র সম্ভাবনা ছিল, পূর্বের চেয়ে শক্তিশালী একটি বাহিনী গঠন করে মুসলিমদের শক্তির মোকাবেলা করা। আর তা মদিনার পার্শ্ববর্তী বড় কিছু গোত্রের সহায়তা ছাড়া সম্ভব নয়। উহুদ যুদ্ধের পর তারা এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক শ্রম ব্যয় করে।

উহুদ যুদ্ধের পর কোনো কোনো গোত্র মুসলিমদের শক্তি হালকা করে দেখতে শুরু করে। তাদের ওপর আক্রমণ করার দুঃসাহস দেখায়। যেমন, আযল ও আল-কারা গোত্র সারিয়্যার দিন মুসলিমদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

বনু সুলাইম বিরে মাউনার দিন মুসলিমদের হত্যা করে। ১১৪৪ রজির দিনের ঘটনাগুলো এক ঘনঘোর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। নবীজি কয়েক দিন এই পরিস্থিতি অবলোকন করেন। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাগাতার যেসব কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছিলেন, বিরে মাউনার ঘটনা ছিল সেসবের একটি। তবে সকল বিরোধী তৎপরতার ওপর তাঁর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মুসলিমদের দুর্বল করে দেখার বিষয়টি এতদূর গড়ায় যে, বনু নাযির নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য চক্রান্ত শুরু করে। এ কথা জানতে পেরে নবীজি তাদের মদিনা থেকে নির্বাসন দেন। তারা এই নির্বাসন প্রত্যাখ্যান করলে ছয়

রাত তাদের অবরোধ করে রাখেন। অন্য বর্ণনামতে, ১৫ দিন অবরোধ করে রাখেন। অবরোধের পর তারা ঘোষণা দেয়, নবীজির শর্তের সামনে আত্মসমর্পণ করতে তারা প্রস্তুত। নবীজি তাদের অস্ত্রসমর্পণ করে মদিনা ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তাব দেন। প্রস্তাব মেনে তারা মদিনা ছেড়ে খায়বারে চলে যায়। কিছু লোক চলে যায় শামে।

➤খন্দকের যুদ্ধ (গাযওয়াতুল আহযাব):

বনু নাযিরকে নির্বাসন দেওয়াই মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যকার সংঘাতের সমাপ্তি ছিল না। তারা খায়বারে থেকে নিয়মিত চক্রান্ত করে যায়। কুরাইশদের সাথে হাত মেলায়। পঞ্চম হিজরির শাওয়াল খ্রিষ্টীয় ৬২৭ সনের মার্চ মাসে মদিনা অবরোধ উপলক্ষ্যে যে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হয়, তার পেছনে ইহুদিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তারা গাতফান গোত্রকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়।

আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদিনা অভিমুখে রওনা হওয়ার জন্য বাহিনীগুলো প্রস্তুত হয়। তারা সংখ্যায় ছিল ১০ হাজার। এক অভিন্ন স্বার্থ তাদের এক ছায়াতলে সমবেত করেছিল; মুহাম্মাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি নিঃশেষ করা এবং তাঁর অনুসারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া। লড়াইয়ের জন্য মুসলিম বাহিনীর আগমনের অপেক্ষায় তারা মদিনার বাইরে সেনাছাউনি স্থাপন করে।

কিন্তু নবীজি অন্যবারের চেয়ে ভিন্ন এক সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কারণ, তিনি বুঝতে পারেন, ৩ হাজারের বেশি সেনা তিনি তৎক্ষণাৎ সংগ্রহ করতে পারবেন না। এ ছাড়া কুরাইশদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া উহুদের শোকাবহ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে। তাই মদিনার ভেতরে থেকে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। উত্তর দিকের এলাকা এবং যেসব জায়গা দিয়ে অশ্বারোহী বাহিনীর হামলার সম্ভাবনা আছে, সেসব জায়গায় পরিখা খনন করেন। ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ বলছে, নবীজিকে এই অভিনব পরামর্শ

দিয়েছিলেন সালমান ফারসি রাযি.। আরবরা ইতঃপূর্বে এই কৌশলের সাথে পরিচিত ছিল না।

এখানে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, মদিনার অন্য জায়গাগুলো পাহাড়, খেজুরবাগান এবং ঘরবাড়ি দিয়ে সুরক্ষিত ছিল।

মিত্রশক্তি প্রায় ৪০ দিন মদিনা অবরোধ করে রাখে। কিন্তু কোনো ক্ষয়ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। আবু সুফিয়ান তখন বনু কুরাইযার অঞ্চল দিয়ে মদিনায় প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ইহুদিদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। প্রত্যেকের ভূমিকা নির্ধারণ করে উভয় দলের মাঝে সমঝোতা হয়। ফলে বনু কুরাইযা মুসলিমদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে।

এই চুক্তি ভঙ্গের কথা জানতে পেরে মুসলিমরা শঙ্কিত হন। তখন নবীজি তাঁদের মন থেকে এই শঙ্কা দূর করার জন্য সচেষ্ট হন। মদিনার তিন ভাগের এক ভাগ ফসলের বিনিময়ে গাতফান গোত্রের সাথে চুক্তি থেকে সরে আসার ব্যাপারে আলোচনা জারি রাখেন। কিন্তু মুসলিমদের খাযরাজ গোত্রের সর্দার সাদ ইবনে উবাদা এবং আউস গোত্রের সর্দার সা'দ ইবনে মুআয উভয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তারা যুদ্ধের পক্ষে সংকল্প ব্যক্ত করেন।

এই সময় বনু কুরাইযার সাথে কুরাইশ মিত্রশক্তির চুক্তি ব্যর্থ করার পেছনে বড় অবদান রাখেন নুআইম ইবনে মাসউদ আল-আশজায়ি রাযি.। তিনি তার কওমের কাছে ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। ঠিক এমন সময় মিত্রশক্তি প্রাকৃতিক কঠোর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি হয়, যা তাদের সর্বপ্রকার রসদ ধ্বংস ও মনোবল দুর্বল করে দেয়। ফলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে মাঠ ত্যাগ করে চলে যায়।

- **হুদায়বিয়ার সন্ধি**

মদিনা অবরোধ থেকে হুদায়বিয়ার সন্ধি-এর মধ্যবর্তী সময়টির তাৎপর্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নতুন নতুন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রকাশ পায়। এর পূর্বে তাঁর সব প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছিলেন কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে; মক্কার শক্তিকে নিঃশেষ করার জন্য। কিন্তু মদিনা অবরোধের পর স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর লক্ষ্য আরও বিস্তৃত এবং তা উল্লেখ করার মতো। এইসব ঘটনায় ধর্মীয় দিকটি ছিল তুলনামূলক প্রধান, যা একই সময়ে সমগ্র আরবকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিয়েছে এবং রাজনৈতিক বিষয়গুলোকেও সফলভাবে এগিয়ে নিয়েছে।

বাস্তবতা হলো, এই সময়ের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তার একটা অংশ মদিনা অবরোধ ও তার ক্ষতিসাধনে কুরাইশদের ব্যর্থতার ফলাফল হিসেবে এসেছে। প্রথমে বনু কুরাইযাকে শাস্তিদানের ঘটনা ঘটেছে। এরপর মুসলিমরা গাতফান গোত্রে আক্রমণ করেছে। কুরাইশদের সাথে মৈত্রীতে আবদ্ধ এমন আরও অনেক গোত্রে ছোট ছোট একাধিক অভিযান প্রেরিত হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে আসাদ, সালাবা, বনু বকর, বনু কিলাব এবং বনু লিহইয়ান উল্লেখযোগ্য। এই অভিযানগুলোর উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত তাদের সতর্ক করা। যেন তারা মদিনা আক্রমণ করার চিন্তাও না করে। অথবা যেন তাদের মক্কার সাথে পুনরায় মৈত্রীচুক্তি নবায়ন করার সুযোগ না ঘটে।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারেন, দক্ষিণে কুরাইশ এবং উত্তরে খায়বারের ইহুদিদের মধ্যে একটি সামরিক চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। উদ্দেশ্য, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টির সুযোগ করে দেওয়া, যেন উদীয়মান ইসলামি রাষ্ট্রকে সাঁড়াশির দুই দাঁতের মতো করে মাঝখানে ফেলে চেপে ধরতে পারে। তখন এই চুক্তি স্বাক্ষরকারীদের সামরিকভাবে পরাজিত করা নবীজির পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি সবচেয়ে কাছের শত্রুকে বোঝাপড়ার মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে বশীভূত করার কথা ভাবেন। সন্দেহ নেই, কাছের শত্রু ছিল কুরাইশ। ষষ্ঠ হিজরির শেষে নবীজি ঘোষণা দেন-তিনি উমরাহ করতে চান। নিয়ত অনুযায়ী উমরাহর জন্য মক্কার উদ্দেশে রওনা দেন। সাথে হাদি (হজ পালনকারী ব্যক্তি কুরবানি করার জন্য সাথে করে যে পশু নিয়ে যায়, তাকে হাদি বলে) নিয়ে যান। এ কথা সুবিদিত যে, কুরাইশরা

নবীজির এই শান্তিপূর্ণ ইচ্ছা মেনে নেয়নি। তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। নবীজি হুদায়বিয়া প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেন। হুদায়বিয়ার অবস্থান মক্কার হারাম অঞ্চলের ভেতরে। পশ্চিম দিকে হাঁটাপথে এক দিনের দূরত্ব।

দুই পক্ষের মধ্যে সংলাপ শুরু হয়। এই ফাঁকে নবীজি প্রস্তাব পেশ করেন যে, তারা যদি উমরাহ পালন করার সুযোগ দেয়, তাহলে আর তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে ধাওয়া করা হবে না। কুরাইশরা এই প্রস্তাবে সম্মত হয়, তবে তা এক বছর পর কার্যকর হবার শর্তে। তবুও নবীজি এই শর্ত মেনে নেন।

নিম্নযুক্ত কতগুলো ধারা ও শর্তের ভিত্তিতে এই সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়:

➤ উভয় পক্ষ ১০ বছরের জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে হাতিয়ার ত্যাগ করবে।

➤ এই বছর মুসলিমরা উমরাহ আদায় না করে মক্কা থেকে ফিরে যাবে। পরবর্তী বছর এসে উমরাহ পালন করবে।

➤ ইসলাম গ্রহণকারী কুরাইশের কেউ যদি মদিনায় চলে যায়, তা হলে নবীজি তাকে ফিরিয়ে দেবেন।

➤ মুসলিমদের কেউ মক্কায় ফিরে এলে কুরাইশরা তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য নয়।

➤ অন্য গোত্রগুলোর সন্ধির যেকোনো পক্ষে যাওয়ার স্বাধীনতা থাকবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইরূপ শর্তে সন্ধিচুক্তি করতে দেখে অনেক সাহাবি তাজ্জব বনে যান। কেউ কেউ হতাশ হয়ে পড়েন। তাঁদের একজন উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.। তবে নবী কারিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিচক্ষণতা ও সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই সমস্যারও সমাধান করেন। তিনি উমর রাযি.-এর প্রশ্নের উত্তরে

বলেন, 'আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল। কিছুতেই আমি তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধে যাব না। তিনিও আমাকে ধ্বংস করবেন না।

বাস্তবতা হলো, এই সন্ধি ছিল মুসলিমদের মঙ্গলের পক্ষে। পক্ষান্তরে এই সন্ধির মাঝে কুরাইশদের দুর্বলতা ও পতন লুকিয়ে আছে। একইভাবে এই চুক্তির মানে হচ্ছে, কুরাইশদের চিৎকার করে মুসলিমদের শক্তি স্বীকার করে নেওয়া। এটা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ এক সন্ধি-যা অন্যান্য গোত্রকে মক্কার সঙ্গে মৈত্রিচুক্তি ভঙ্গ করে মুসলিমদের কাতারে শামিল হবার সুযোগ করে দেয়। যেমনটা খুযাআ গোত্র করেছিল। গোত্রগুলোকে দাওয়াত দেওয়ার স্বাধীনতা দিলে নবীজি কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

এই চুক্তি ব্যাপকভাবে নবীজির সুদূরপ্রসারী রাজনীতির কাজে এসেছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক **এই সন্ধিকে ইসলামের মহান বিজয়** বলে আখ্যায়িত করেছেন

- **বিভিন্ন রাজা-বাদশার নিকট নবীজির পত্র প্রেরণ**

হুদায়বিয়ার সন্ধি নবীজিকে আরও অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণে স্বাধীনতা এনে দেয়। ইসলামের দাওয়াত যেহেতু সর্বজনীন, তাই নবীজি পার্শ্ববর্তী রাজা-বাদশাদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে পত্র লেখেন। তারা হলেন-রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস (Heraclius), হারিস ইবনে আবি শামর আল-গাসসানি, হাবশার বাদশাহ নাজাশি (Najashi), পারস্যের কিসরা, মিসরের মুকাওকিস (Al-Muqawqis), ইয়ামামার আমির হাউজা আল- হানাফি (Hawdha Al-Hanafi), বাহরাইনের বাদশাহ মুনযির, ওমানের রাজা জাইফার ইবনুল জুলান্দি (Jayfar Ibn Al-Julandi) ও আব্বাদ ইবনুল জুলান্দি। তারা উভয়ে ছিলেন আদ অধিবাসী ওমানের বাদশাহ।

একেকজনের উত্তর একেক রকম ছিল। কেউ কেউ সুন্দর জবাব দিয়েছেন। যেমন, নাজাশি ও মুকাওকিস। কেউ কেউ অভব্যভাবে জবাব দিয়েছেন। যেমন, গাসসানের রাজা ও পারস্যের কিসরা।

- **বাইজেন্টাইনদের মুখোমুখি (মুতার যুদ্ধ)**

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিকের বাণিজ্যিক রুটটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বিশেষ করে কুরাইশের সাথে সংঘাত তৈরি হবার পর থেকে। কুরাইশদের ব্যবসাকে এর মাধ্যমে সংকুচিত করে দিয়েছিলেন। তিনি এই রুটের পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলোকে বশীভূত করে নিয়েছিলেন। কারণ, একদিক থেকে রাজনৈতিক বিবেচনায় এই রুটটির গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ অপরদিকে তার লক্ষ্য হলো, আরবীয়দের একসারিতে ঐক্যবদ্ধ করা এবং জাজিরাতুল আরবের বাইরে উত্তর দিকে ক্ষমতা-বলয়ের বিস্তৃতি সাধন করা।

মুতার যুদ্ধ এই মনোভাবের প্রমাণ বহন করে। এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল-শুরাহবিল ইবনে আমর আল-গাসসানি কর্তৃক নবীজির পত্রবাহী দূতকে হত্যা করা। তখন নবীজি যায়েদ ইবনে হারিসা রাযি.-এর নেতৃত্বে ৩ হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী প্রস্তুত করে দেন। উত্তর দিকে বাহিনী যাত্রা করে অষ্টম হিজরির জুমাদাল উলা মোতাবেক সেপ্টেম্বর ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে। বাহিনীর সদস্যরা মুতা জনপদের নিকট আরব গোত্রদের দ্বারা গঠিত একটি বাইজেন্টাইন সেনাদলের মুখোমুখি হয়। মুতা হলো বালকার (Balqa) একটি জনপদ।

মুসলিম বাহিনী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিসহ আক্রমণ করতে পারেনি। সংখ্যায় অধিক বাইজেন্টাইন বাহিনীর মোকাবেলায় মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়। তিন তিনজন সেনাপতি শহিদ হলে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. বাহিনী নিয়ে মদিনায় ফিরে আসেন। শহিদ সেনাপতিগণ হলেন, যায়েদ ইবনে হারিসা, জাফর ইবনে আবি তালিব এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.।

এতৎসত্ত্বেও এই পরাজয় মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কোনো প্রভাব ফেলেনি। ইসলামের দাওয়াত প্রসারিত হয়েই চলে। গোত্রগুলো একের পর এক মদিনায় প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে চলে।

- **মক্কা বিজয়**

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মক্কাবাসী অনুভব করে, তাদের শহর পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা রাজনৈতিক মতের দিক থেকে স্পষ্ট দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল মক্কার বয়স্ক ও স্বার্থবাজদের সাথে যোগ দেয়। তারা মুসলিমদের সাথে লাগাতার বিরোধ চায়। আরেকদল যুবকদের সাথে যোগ দেয়। যারা বুঝতে পারে, মুসলিমদের শক্তিবৃদ্ধি ও মক্কার শক্তি ক্ষয়ে গেলে মক্কায় তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

অষ্টম হিজরিতে কুরাইশ কর্তৃক সন্ধির শর্ত লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। তারা তাদের মিত্রগোত্র বনু বকরকে নবীজির মিত্রগোত্র বনু খুযাআর বিরুদ্ধে অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করে। এই ঘটনা নতুন করে যুদ্ধের পথ খুলে দেয়। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০ হাজার যোদ্ধা নিয়ে অষ্টম হিজরির রমজান মাস মোতাবেক ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মক্কা অভিমুখে রওনা হন। নবীজি তাঁর বাহিনী নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে চারটি প্রবেশপথ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ

করতে সক্ষম হন। তবে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর দলটি বাধার মুখোমুখি হয়েছিল। খুব দ্রুত তিনি তাদের পরাজিত করতে সক্ষম হন।

নবীজি মক্কায় প্রবেশ করে সাতবার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন এবং মূর্তিগুলো সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। তারপর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। বড় ধরনের অপরাধের কারণে কয়েকজনকে সাধারণ ক্ষমার আওতামুক্ত ঘোষণা দেন। মক্কায় নবীজি ১০ কিংবা ২০ দিন অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি সেখানকার প্রশাসনিক বিষয়-আশয় গুছিয়ে নেন। বিশেষ করে হারাম অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ এবং কুরাইশরা পূর্বে যেসব বিশেষ সুবিধা ভোগ করত, সেসব বাতিল করেন।

- **নবীজির অন্তিম যুদ্ধ**

তাবুক যুদ্ধ ছিল মুতার যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয় ফিরিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপ এবং উত্তর দিকে বাইজেন্টাইন সীমান্তে অবস্থিত গোত্রগুলোকে ইসলামে প্রবেশের দাওয়াত প্রদান। ইতোমধ্যে নবীজি মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ফিলিস্তিন সীমান্তে রোমক বাহিনী জমা করার সংবাদ জানতে পারেন। তখন নবীজি একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন; যার নাম দেন 'জাইশুল উসরাহ' অর্থাৎ অনটনগ্রস্ত সেনাবাহিনী। কারণ, এই যুদ্ধের প্রস্তুতি ও রওনা-উভয়টি হয় লোকদের অনটন, তীব্র গরম ও দুর্ভিক্ষের সময়। সামর্থ্যবান সাহাবিরা প্রচুর দান করেন। তা দিয়ে দরিদ্র সাহাবিরা প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে মদিনা থেকে রওনা হন নবম হিজরির রজব মাসে। খ্রিষ্টীয় ক্যালেন্ডারে তখন ৬৩০ সনের অক্টোবর মাস। তারপর তিনি তাবুক পৌঁছেন। সেখানে কয়েক দিন অবস্থান করে তাবুকবাসীর সঙ্গে সন্ধি করেন। নবীজি সেখানে আইলা (Ayla), আযরুহ (Udhruh) ১০৫) এবং জারবা অঞ্চলের কয়েকটি

গোত্রের প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-কে দুমাতুল জান্দালের (Dumah Al-Jandal) সর্দার উকাইদিরের কাছে পাঠান। খালিদ বিন ওয়ালিদ তাকে বন্দি করেন এবং দুমাতুল জান্দাল জয় করে ফিরে আসেন।

এটা স্পষ্ট যে, রোমক বাহিনী মুসলিমদের তাবুক পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার খবর জানতে পেরেছিল; তাই তারা নিজেদের সীমান্তের ভেতর সরে আসাকে শ্রেয় মনে করে। আরবদের সামরিক তৎপরতার পরীক্ষিত বিজয়ক্ষেত্র মরুভূমি থেকে দূরত্ব বজায় রেখে নিজেদের ঘাঁটির কাছাকাছি থেকে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্তকে তারা প্রাধান্য দেয়।

নবীজি রোমকদের সরে যাওয়ার কথা জানতে পেরে মদিনায় ফিরে আসেন। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের আমিরদের ওপর তাঁর নামমাত্র কর্তৃত্ব যথেষ্ট মনে করেন। এটি ছিল নবীজির স্বশরীরে অংশগ্রহণ করা শেষ যুদ্ধ।

- **নবীজির ওফাত**

দশম হিজরিতে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১ লক্ষ সাহাবির এক বিশাল কাফেলা নিয়ে হজ আদায়ের লক্ষ্যে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করেন। খ্রিষ্টীয় ক্যালেন্ডারে তখন ৬৩১ সন। আরাফার পাহাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে নবীজি তাঁর ঐতিহাসিক বিদায়ী ভাষণ প্রদান করেন। যেটিকে ইসলামি সংবিধানের অংশ গণ্য করা হয়। এই ভাষণে তিনি ইসলামের মূলভিত্তি, মূলনীতি ও নিয়মনীতি নির্ধারণ করে দেন। মানুষের মাঝে সমতা বিধানের আহ্বান জানান। তারপর হজ শেষ করে মদিনায় ফিরে যান।

বিদায় হজের তিন মাস পার হয়েছে মাত্র। একদিন নবীজি জ্বরে আক্রান্ত হন। ৬৩ বছর বয়সে একাদশ হিজরির ১২ রবিউল আউয়াল নবীজি ওফাত লাভ করেন। খ্রিষ্টীয় ক্যালেন্ডারে সময়টা তখন ৬৩২ সনের জুন মাসের সাত তারিখ। মৃত্যুর পূর্বে নবীজি তাঁর ওপর অর্পিত রিসালাত ও আমানত যথাযথভাবে পরবর্তীদের কাছে পৌঁছে দেন। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাযি.-এর ঘরে ওফাত লাভ করেন। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

কিন্তু এখানেই শেষ হয় নি ইসলামি সভ্যতার বরং ওফাতের সময় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখে যান দৃঢ়, সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ একটি উম্মাহ। লাগাম পরিয়ে যান জাতিবাদী-অন্ধত্ব ও কুসংস্কারের মুখে। প্রতিষ্ঠিত করে যান এক সরল সুস্পষ্ট মজবুত ধর্ম-যা আজও টিকে আছে। রেখে যান চারিত্রিক উৎকর্ষ; যার ভিত্তি হলো নির্ভীকতা ও সম্মানবোধ। এক প্রজন্মে তিনি বহু যুদ্ধে বিজয় লাভ করতে সক্ষম হন। প্রতিষ্ঠা করেন একটি বিশাল রাষ্ট্র।

তাঁর রেখে যাওয়া সুসংহত, নির্ভীক ও দৃঢ়প্রত্যয়ী অনুসারীরা ইসলামের বিস্তৃতি ঘটান পৃথিবীর সকল প্রান্তে। তাঁরা জয় করে নেন বড় প্রতাপশালী রাজ্য গুলো। প্রতিষ্ঠা করেন খিলাফত। এখনো ইসলামের বিস্তরণ ঘটেই চলেছে। সবচেয়ে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে এই ধর্মের অনুসারীর সং্খ্যা। মূলত এর মাধ্যমেই ইসলামি সভ্যতা বিকশিত হচ্ছে দুনিয়ার সকাল প্রান্তরে।

ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি বনাম পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তি

ইসলামি সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিগত দূরত্ব বিরাট। ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি হলো-লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ, যা থেকে তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম, কিয়ামত ও বিচার দিবসের বিশ্বাসের কথা আসে। আর পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি হলো, সেক্যুলারিজম, ডেমোক্রেসি, ডারউইনিজম, মেটেরিয়ালিজম ইত্যাদি। এসব মৌলিক ভিত্তির দিক দিয়ে ইসলামি সভ্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত হলো পাশ্চাত্য সভ্যতা।

ইসলামি সভ্যতার প্রধান ভিত্তিসমূহের একটি হলো, আখিরাতের জবাবদিহিতা। মানুষ দুনিয়ায় যা কিছু করে এর নৈতিক ফল মৃত্যু পরবর্তী জীবনে পাওয়া যাবে। এ বিশ্বাস ছাড়া কারও পক্ষেই নৈতিক মান রক্ষা করে নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন সম্ভব নয়।

খ্রিষ্টধর্মে আখিরাতে বিশ্বাসের ধারণা থাকলেও গডকে ফাঁকি দিয়ে পাবার উপায় তারা আবিষ্কার করে নিয়েছে। তারা বিশ্বাস করে, যিশুখ্রিষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যিশুতে বিশ্বাসী সকল মানুষের যাবতীয় পাপের কাফফারা আদায় করে গেছেন। তাই তার প্রতি বিশ্বাস থাকলেই আখিরাতের জন্য যথেষ্ট। তাদের এ বিশ্বাস তাদের পাপ করার বৈধতার সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে। ক্ষমা যখন নিশ্চিত তখন পাপে দ্বিধা থাকবে কেন?

ইসলামে Honesty is a value আর পাশ্চাত্য সভ্যতায় Honesty is a policy অর্থাৎ ইসলামের মতে সর্বাবস্থায় সততা অবলম্বন করতে হবে। আর পাশ্চাত্য সভ্যতায় নীতি হিসেবে সততাকে লাভজনক বলে গ্রহণ করা হয়। ব্যবসায়ে উন্নতির স্বার্থে সততা প্রয়োজন; কিন্তু যদি ধরা পড়ার আশঙ্কা না থাকে তাহলে সততা জরুরি নয়। অসৎ উপায়ে উন্নতি করতে বাধা নেই, যদি আইনকে ফাঁকি দেওয়া যায়। আইন, পুলিশ ও লোকলজ্জার ভয়ে সততা পালন করা হয়ে থাকে। ইসলাম অনুযায়ী আল্লাহর ভয়ে সৎ থাকতে হবে, যাতে আখিরাতে শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কারণ, আইন ও পুলিশ নাগাল না পেলেও এবং অন্য কোনো মানুষ না দেখলেও আল্লাহ সর্বাবস্থায় দেখছেন। তাঁকে ফাঁকি দেওয়ার কারও কোনো সুযোগ নেই-এ বিশ্বাস নৈতিকতা মেনে চলতে বাধ্য করে।

কুরআনে বলা হয়েছে-আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের জবাবদিহিতার চেতনা ছাড়া কোনো মানুষ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে পারে না। পাশ্চাত্য সভ্যতা এ চেতনার ধারই ধারে না

- **ভিত্তির সমূহের প্রভাব:**

ইসলাম তার অনুসারীদের ইসলামি সভ্যতার যে ভিত্তি প্রদান করেছে, যারা তা মেনে চলে তাদের চরিত্রে নিম্নরূপ গুণাবলি দেখা যায়-

১. তারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করে, আখিরাতে আল্লাহর নিকট দুনিয়ার কৃত যাবতীয় কর্মের হিসাব দিতে হবে বলে সর্বদা সতর্ক হয়ে জীবনযাপন করে।

২. তারা অবৈধ ও অনৈতিক উপায়ে সম্পদ হাসিলের চেষ্টা করে না। কারও সাথে প্রতারণা করে না। তবে এক-দুজন পাপাচারী থাকবে-এ কথা ভুলে গেলে চলবে না। তদ্রূপ এটিকে মৌলিক বিষয় হিসেবে গণ্যও করা যাবে না।

৩. কারও উপর তারা সামান্য অন্যায় করে না।

৪. নিজের স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীদের সাথে তারা যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে না। এমনকি পরনারীর প্রতি কুদৃষ্টিও দেয় না।

৫. ইসলাম দুনিয়াকে ভোগ করার যতটুকু অধিকার দিয়েছে এবং যে নিয়মে ভোগ করার অনুমতি আছে, একমাত্র ততটুকুই নির্ধারিত নিয়মে তারা ভোগ করে। তারা বৈরাগ্য অবলম্বন করে না। এমনকি ভোগবাদীদের মতো লাগামহীনও হয় না ইত্যাদি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি দেশে ইসলামি জীবনবিধান জনগণের নিকট পেশ করেন, যে দেশে সেকালের সভ্য দুনিয়ার (রোম ও পারস্য সভ্যতা) কোনো আলো পৌঁছেনি। সভ্য দুনিয়া তাদের বর্বর জাতি বলেই মনে করত। তারা বংশানুক্রমিকভাবে গোত্রে গোত্রে মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানিতে লিপ্ত ছিল। লেখাপড়ার চর্চা ছিল না বললেই চলে। জনগণের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কারণ, দেশে কোনো একক সরকারের অস্তিত্বই ছিল না।

এমন একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামি শিক্ষা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালে মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে গোটা আরবে এমন একটি আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, যা মানবজাতির ইতিহাসে সেরা কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা যারা গ্রহণ করেছেন তাদের চরিত্রে উল্লিখিত গুণাবলি সৃষ্টি হওয়ার ফলেই আরবের বর্বর জাতি উন্নত সভ্য জাতিতে পরিণত হয়। ইসলামি সভ্যতায় সমৃদ্ধ এ জাতি কিছুদিনের মধ্যেই রোম ও পারস্য সভ্যতার উপর বিজয় লাভ করে। এ কারণে মাইকেল হার্ট তার লেখা 'দি হানডেড নামক বিখ্যাত গ্রন্থে মানবজাতির ইতিহাস থেকে বাছাই করা ১০০ জন মনীষীর মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন।
পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিসমূহকে যারা সঠিক বলে মনে করে তাদের চরিত্র নিম্নরূপ হওয়া স্বাভাবিক :

১. সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে কোনো জ্ঞান নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করে না বলে তারা নফসের গোলাম হতে বাধ্য। নফস মানে দেহের দাবির সমষ্টি। দেহের যাবতীয় দাবি পূরণ করতে বিনা বাধায় তারা তৎপর। দেহের কোনো নৈতিক চেতনা না থাকায় তারা নৈতিক বন্ধন থেকে মুক্ত অবস্থায় বস্তুজগৎকে ভোগ করতে থাকে।

২. সকল মানুষের মধ্যেই নৈতিক চেতনা রয়েছে। এ চেতনাই আসল মানুষ। তাই দেহের দাবি পূরণের পথে নৈতিক চেতনা অবশ্যই আপত্তি করে। কিন্তু তারা আল্লাহকে ভয় করে না এবং আখিরাতকে পরওয়া করে না বলে ঐ চেতনা সর্বাবস্থায় সক্রিয় থাকে না। আইন ও পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কা না থাকলে এবং লোকলজ্জার ভয় না থাকলে বিবেকের বিরুদ্ধে দেহের দাবি পূরণ করতে তারা দ্বিধা করে না।

৩. তারা স্বাভাবিক কারণেই গ্রিক দার্শনিক Epieurus-এর ভোগবাদী দর্শনের অনুসারী হয়ে যায়। ভোগবাদী দর্শনের কথা হলো, মানব-জীবনের লক্ষ্যই হলো উপভোগ (Pleasure)। এই এপিকিউইয়ান ফিলসফির স্লোগানই হলো, Eat. drink and be merry খাও, দাও, ফুর্তি করে বেড়াও। এটাই তাদের জীবনের নেশা হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ মানুষের জীবনে এর

চেয়ে বড় কিছু জীবনের লক্ষ্য বলে গণ্য হয় না। অবশ্য যারা চিন্তাশীল, গবেষক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি, লেখক, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইনজিনিয়ার ও গুরুত্বপূর্ণ পেশাজীবী, তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে তৎপর থাকলেও অবসর সময়ে তাদের ভেতর ঐ ভোগবাদী মনোভাবই প্রাধান্য লাভ করে।

৪. তাদের মধ্যে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও যৌনসম্পর্ক আইনসিদ্ধ বলে স্বীকৃত। তাই তাদের পারিবারিক জীবন সুখময় হতে পারে না। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই মনে করে, তাদের জীবনসঙ্গী অন্যের শয্যাসঙ্গী হতে পারে। এটাকে তারা দূষণীয় মনে করে না। তাদের সন্তানের পিতা কে, তা নিশ্চিত নয় বলে তাদের পাসপোর্টে শুধু মায়ের নাম লেখা হয়ে থাকে, পিতার নাম থাকে না। কারণ, মা-ই শুধু নিশ্চিত জানা। কুমারী মাতার সংখ্যাও প্রচুর। তাদের দাম্পত্যজীবন স্থায়ী নয়, ব্যাপক হারে তালাক হয়।

অর্থাৎ সারকথা হলো-পাশ্চাত্যের বর্তমান সকল সংকটের মূলে রয়েছে চারটি বিষয়। এ চারটি বিষয়ে তারা চায় অবাধ স্বাধীনতা। এ চারটি বিষয়

- Freedom of Faith অর্থাৎ বিশ্বাসের স্বাধীনতা যেটা আমরা সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা বলে জানি। এ বিষয়ে উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

- Freedom of Speech অর্থাৎ মত প্রকাশের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা। পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা বলতে অবাধ স্বাধীনতা যাকে বলে।

- Freedom of Ownership অর্থাৎ সম্পদ অর্জনে মালিকানার স্বাধীনতা।

- Personal Freedom অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

এর বাইরে আরও কিছু বিষয় রয়েছে। যেমন হিউম্যানিজম, মর্ডানিজম ও ফেমিনিজম। চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইতালিতে হিউম্যানিজমের আবির্ভাব ঘটে এবং ক্রমান্বয়ে তা

ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য- সংস্কৃতির ভিত্তি হচ্ছে এই হিউম্যানিজম। হিউম্যানিজমে মানুষ স্বাধীন এক অস্তিত্ব। এ মতবাদ অনুযায়ী, মানবজীবনে ঐশী দিক নির্দেশনার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রকৃতি ও ইতিহাসেই মানুষের পূর্ণতাকে খুঁজে বেড়ায় এ মতবাদ। এখানে ব্যক্তিই সব কিছু। এর উপরে আর কিছু নেই।

বিপরীতে ইসলাম বা মুসলমানদের অবস্থান হলো—আসমানি ফায়সালা। আমাদের সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। জীবনব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। আর জীবন পরিচালনার জন্য দিক-নির্দেশনাও দিয়েছেন আল্লাহ। আর এসব কিছু যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকেই সেহেতু জীবন পরিচালনার দিক-নির্দেশনাও আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর সেটিই হবে আমাদের জীবনের উত্তম পাথেয়।

সভ্যতার সভ্যতায় দ্বন্দ্ব

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যামুয়েল পি হান্টিংটন The Clash of Civilization গ্রন্থে ইসলামের সঙ্গে পশ্চিমা সভ্যতার সংঘাত এভাবে তুলে ধরেছেন :

“ইসলামি মৌলবাদ পশ্চিমাদের জন্য মূল সমস্যা নয়; বরং সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন সভ্যতার ইসলামি ধারক হওয়ার কারণে খোদ ইসলামই তাদের মূল সমস্যা । কারণ এ ধর্মের অনুসারীরা তাদের নিজেদের জীবনাচার বা ইসলামের সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে; যদিও নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের দীনতা বর্তমান তাদের মনকে কিছুটা দুর্বল করে রেখেছে। একইভাবে ইসলামের জন্য CIA কিংবা আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কোনো সমস্যা নয়, বরং পুরো পশ্চিমা সভ্যতাই তাদের জন্য একটি বড় সমস্যা। কারণ, তারাও বিশ্বাস করে যে, তাদের জীবনধারা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বজনীন। এমনকি তারা এ-ও বিশ্বাস করে যে, শক্তি প্রয়োগ করে হলেও গোটা বিশ্বের মানুষকে আমাদের সভ্যতা মেনে নিতে বাধ্য করা উচিত। ইসলাম এবং পশ্চিমা বিশ্বের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পেছনের এটাই হলো মূল কারণ। ”

বর্তমানে যদিওবা ব্যাপক মাত্রায় প্রচার করা হয়ে থাকে যে, 'ইসলামি মৌলবাদই পশ্চিমাদের নতুন রাজনৈতিক তত্ত্ব 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' এর জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।' পশ্চিমা মিডিয়াগুলো ইসলামি মৌলবাদকে বিশ্বের সকল সমস্যার কারণ আখ্যা দিতে ব্যস্ত। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার একটি প্রবন্ধে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

'বিশ্বশান্তি এবং নিরাপত্তার প্রধান হুমকি হিসেবে দৃশ্যপটে মুসলিম মৌলকে আবির্ভূত হচ্ছে বেপরোয়াভাবে। শুধু তাই নয়, বরং তা জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে নানা প্রকার গোলযোগ সৃষ্টি করছে। ১৯৩০ এর দশকে নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদ এবং পরবর্তীকালে পঞ্চাশের দশকে সমাজতন্ত্র যে ভীতিকর অবস্থা জন্ম দিয়েছিল, ইসলামি মৌলবাদের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে।

তবে অধ্যাপক হান্টিংটন এসব দাবিকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়ে গোটা ইসলামকেই পশ্চিমাদের জন্য সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিত করেছেন। কেননা ইসলামি সভ্যতা মৌলিকভাবে পশ্চিমা সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধনী।

তিনি এর পেছনে দুটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন, যাকে তিনি এই দ্বন্দ্বের অন্যতম চালিকাশক্তি বলে মনে করেন -

- মুসলমানরা নিজেদের সংস্কৃতিকে অন্য যেকোনো সংস্কৃতি থেকে শ্রেষ্ঠতর ও মর্যাদাকর বলে মনে করে। অধিকাংশ মুসলিম গর্বভরে দাবি করে যে, তাদের ধর্ম ইসলাম অন্য যেকোনো ধর্ম বা দর্শন থেকে শ্রেষ্ঠ। 'ইসলামি জীবনব্যস্থা বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।'-এই বিশ্বাসের স্বাভাবিক দাবি হিসেবে তাদের মধ্যে এ ধরনের আত্মবিশ্বাসী মনোভাব জন্ম নিয়েছে। আর এটা মনে করা তো আসলেই যুক্তিসংগত যে, মহান আল্লাহর প্রেরিত ধর্মের অনুশীলন যে সংস্কৃতির জন্ম দেয়,

নিঃসন্দেহে তা মানুষের গবেষণা, আন্দাজ-অনুমানভিত্তিক সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে শ্রেষ্ঠতর হবে।

- মুসলমানদের মনে তাদের দেশে ইসলামি আইন বা শরিয়াহ বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষা। আলজেরিয়া, মিসর, চেচনিয়া, বোসনিয়া, দাগেস্তান, তিউনিশিয়া, লিবিয়া, সিরিয়াসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে যে অস্থিতিশীলতা বর্তমানে বিরাজমান তা এই স্পৃহারই বহিঃপ্রকাশ। ইউরোপিয়ান ঔপনিবেশিক যুগে তারা মুসলিম দেশগুলোর শরিয়াহ ভিত্তিক আইনব্যবস্থাকে ইউরোপিয়ান আইনকাঠামো দিয়ে প্রতিস্থাপন করে। আর নব্য সাম্রাজ্যবাদের এই যুগে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের হাতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কিছু নামধারী মুসলমানদের হাতেই শাসন-কর্তৃত্বের লাগাম উঠেছে এবং তারাও সেই ইউরোপিয়ান আইন অনুসারে মুসলিম দেশগুলো শাসন করছে। বর্তমানে বেশিরভাগ মুসলিম দেশের সরকার ব্রিটিশ, ফরাসি, জার্মান এবং ডাচ আইন দ্বারা দেশ শাসন করছে, আর ইসলামি আইনগুলোকে কেবল পারিবারিক জীবনের মাঝে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। এ কারণে ইসলামের পুনর্জাগরণের ঢেউ মুসলিম বিশ্বকে বারবার আন্দোলিত করছে। মুসলিম জাতির মনে বহিঃশক্তির প্রভাবমুক্ত স্বাধীন ও ইসলামি শাসনব্যবস্থার দাবির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে প্রশাসনের সঙ্গে সহিংস সংঘাতের আকারে।

অধ্যাপক হান্টিংটন আমেরিকার সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ)- কে মুসলমানদের প্রধান শত্রু মনে করার যৌক্তিকতা নাকচ করে দিয়েছেন।

যদিও বিভিন্ন দেশের সরকার পতন এবং অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে হত্যার সাথে সম্পৃক্ততার কারণে সিআইএ'র যথেষ্ট কুখ্যাতি আছে; কিন্তু তারপরও তিনি বলছেন যে, সিআইএ মুসলমানদের প্রধান শত্রু নয়। তিনি আমেরিকান সেনাবাহিনীকেও এই তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন; যদিও সৌদি আরবের মাটিতে এই সেনাবাহিনী ঘাঁটি স্থাপন করেছে এবং ইরাককে ধ্বংস করেছে, সুদান এবং আফগানিস্তানে মিসাইল আক্রমণ করেছে এবং প্রকাশ্যে ইসরাইলকে সমর্থন দিয়ে আসছে।

সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিত করতে গিয়ে অধ্যাপক হান্টিংটন বলেন, মুসলিম বিশ্ব প্রধান যে সমস্যা মোকাবিলা করছে, তা হলো-স্বয়ং পশ্চিমা সভ্যতা; এটা নিছক সিআইএ'র ষড়যন্ত্র বা আমেরিকান সেনাবাহিনীর দখলদারিত্বের বিষয় নয়। তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেন, এ সমস্যার মূলে রয়েছে পশ্চিমা সভ্যতা কর্তৃক নিজেদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও জীবনধারাকে অন্য যেকোনো সংস্কৃতির চেয়ে উন্নতর মনে করা। পশ্চিমারা মনে করে, অন্য সকলের উচিত আমাদের সভ্যতা মেনে নেওয়া, আমাদের রীতি-নীতি অনুসরণ করা এবং সে হিসেবে জীবনযাপন করা।

অধ্যাপক হান্টিংটন আরও একধাপ এগিয়ে যে বাস্তবতাটি তুলে ধরেছেন, তা হলো-পশ্চিমারা নিজেদের জীবনব্যবস্থাকে অন্য সকলের জন্য কেবল যথাযথই মনে করে না, বরং অন্যদের তাদের সংস্কৃতি মেনে নিতে বাধ্য করাকেও তারা তাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব মনে করে। আর সে দায়িত্ব পালনের জন্য রাজনৈতিক, কূটনৈতিক কিংবা সামরিক পন্থাও অবলম্বন করা যেতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করে।

একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় এ ব্যাপারগুলো যে সভ্যতার চলমান সংঘাতে মূল উপাদান ও অনুঘটন হিসেবে কাজ করছে তা প্রফেসর হান্টিংটন যথাযথই শনাক্ত করেছেন।

পশ্চিমা কিছু মতবাদ ও ইসলামের অবস্থান

- **বস্তুবাদ**

Matter বা বস্তু কিংবা জড়পদার্থ মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যা কিছু দেখা যায়, ধরা যায়, যার অস্তিত্ব বাস্তবে টের পাওয়া যায় তাকেই বস্তু বলা হয়। খ্রিষ্টধর্মের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধ যখন চরমে পৌঁছে তখন দার্শনিক Hume দাবি করেন যে, বস্তুর ঊর্ধ্বে আর কিছু

নেই। যদি থাকেও তা আমাদের প্রয়োজনে আসে না। এ মতবাদকেই Materialism বা বস্তুবাদ বা জড়বাদ ব্য হয়।

বিজ্ঞান শুধু বস্তু ও বস্তুগত শক্তি (Matter and Material Energy) নিয়েই চর্চা করে। বিজ্ঞানের উন্নতি মানুষকে অত্যন্ত সহজেই প্রভাবিত করে, বিজ্ঞানের আবিষ্কার তো বাস্তব সত্য হিসেবেই ধরা দেয়। খ্রিষ্টান পাদ্রিরা এ বিজ্ঞানের বিরোধিতা করার ফলে বিজ্ঞানের প্রভাবিত মানুষ ধর্মের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়। গড, বাইবেল, প্রফেট, পরকাল, দোজখ, জান্নাত ইত্যাদি যেহেতু বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে, সেহেতু এসবকে ধর্মীয় নেতাদের মনগড়া চিন্তার ফসল বলে উড়িয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক। ধর্মের নামে অযৌক্তিক বাড়াবাড়িই ধর্মের বিরুদ্ধে এ বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

Hume এ মনোভাবটিকে দার্শনিকতার রূপ দান করে দাবি করেন যে, বস্তুর বাইরের কোনো কিছুকে বিশ্বাস ও স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, সেসব মানুষের বাস্তব জীবনে কাজে আসে না। তাই বস্তুবাদে যারা বিশ্বাসী তাদের নিকট আল্লাহ, রাসুল, ওহি, পরকাল ইত্যাদি নিছক অন্ধবিশ্বাসও কুসংস্কার মাত্র। আধুনিক মতবাদ হিসেবে বস্তুবাদ পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে এ মতবাদ চরম জাহেলিয়াত। এ মতবাদকে সত্য বলে স্বীকার করলে মানুষের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়। অথচ ইসলামের বক্তব্য হলো, মানবদেহ বস্তুগত সত্তা হলেও আসল মানুষটি বস্তু নয়, বরং তা রুহ। সুতরাং ভালো ও মন্দের বিচারবোধ বা বিবেকের অস্তিত্বকে কেমন করে অস্বীকার করা যায়? বিবেককে জড় পদার্থ বলে দাবি করার কী যুক্তি থাকতে পারে?

বিশ্বে কি বস্তুই সবকিছু? ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া, মমতা, সহানুভূতি ইত্যাদির কি কোনো অস্তিত্ব নেই? বস্তুজগৎ নিয়ে গবেষণায় তৎপর ল্যাবরেটরি কি এসব নিয়ে গবেষণা করতে সক্ষম? এসবই বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে। অথচ এসবের অস্তিত্ব মানবজীবনে স্বীকৃত

মহাসত্য। সন্তানের জন্য মায়ের ত্যাগ, আদর্শের জন্য আত্মত্যাগের জজবা অস্বীকার করা কি সম্ভব? এসব অস্তিত্ববান হলেও বিজ্ঞানের নাগালের মধ্যে পড়ে না। পরীক্ষাগারে যা আনা সম্ভব, বিজ্ঞানের আলোচনা তো ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ। তাই বস্তুর উর্ধ্বেও সত্যের অস্তিত্ব রয়েছে এটা মানতেই হবে। কিন্তু এ বিষয়টি মানতে পশ্চিমারা নারাজ। কারণ, আগেই বলা হয়েছে তারা বস্তুবাদে বিশ্বাসী। আর এ কারণেই তারা বিয়ে করে পরিবার গঠন করার চেয়ে লিভ-টুগেদারেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। নাবালক সন্তান বেবি কেয়ারে পারিবারিক বন্ধনহীনভাবে পিতা-মাতার স্নেহ বঞ্চিত হয়ে বেড়ে ওঠাই তাদের কাছে অধিক পছন্দের। তারা বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে দেখাশোনার জন্য বৃদ্ধাশ্রমের উপর নির্ভর করে। পারিবারিক বন্ধনহীনতা ও বিকৃত মানসিকতা সেখানে এমনরূপ ধারণ করেছে যে আজ কুকুর-বিড়ালের সাথেও তারা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে।

- **ডারউইনিজম**

পশ্চিমা দেশগুলোতে ১৯ শতকের আগ পর্যন্ত অধিকাংশ মানুষ এবং সমাজের উঁচু শ্রেণির চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও প্রায় সকলেই ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু এরপরে যখন ইউরোপিয়ানরা ভূগোল ও জীববিজ্ঞানে ঐতিহাসিক উন্নতি সাধন করল তখন তাদের ধর্মবিশ্বাসের উপর এলো এক প্রচণ্ড ধাক্কা। ১৯ শতকের প্রথম দিকেও অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করতেন যে, ওল্ড টেস্টামেন্টে পৃথিবীর আদি ইতিহাস সম্পর্কে অক্ষরে অক্ষরে সঠিক জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যাবে। তাই তারা ওল্ড টেস্টামেন্টের তথ্যের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে একটি অনুসন্ধান দাঁড় করালেন। তারা বাইবেলিয় genealogy বা ক্রমবিকাশবিদ্যা থেকে পৃথিবীর বয়স হিসেব করলেন। নূহ এর সময়ে যে প্লাবন হয়েছিল, তার বিশ্লেষণ করে তারা প্রমাণ করতে চাইলেন, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী এটি কোনো স্বাভাবিক ঘটনা নয়, অতিপ্রাকৃতিক কোনো শক্তির হাত ছাড়া এমন আকস্মিক ও ক্ষণকালীন

ঘটনা ঘটতে পারে না। এই তত্ত্বকে বলা হতো 'বিপর্যয়বাদ' বা catastrophism; কারণ এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণ এর মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৩০ সালে চার্লস লাইলের লেখা 'Principles of Geology' বইটি বিপর্যয়বাদ তত্ত্বের অনুসারীদের দাবি সম্পূর্ণরূপে খন্ডন করে এ তত্ত্বকে উড়িয়ে দিল। তিন খণ্ডের এই বইটিতে লাইল অত্যন্ত সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করেন যে, বাহ্যত অতিপ্রাকৃতিক মনে হলেও স্বাভাবিক নিয়মবহির্ভূত এই ধরনের ঘটনাগুলো প্রকৃতির নিয়মের আওতায় ঘটা খুবই সম্ভব। তার গবেষণায় আরও দেখালেন যে, বাইবেল অনুযায়ী পৃথিবীর যে বয়স হিসাব করা হয়েছিল তার থেকে বাস্তব বয়স অনেক বেশি।

এবার তরুণ ডারউইন লাইলের Principle of Geology বইটির ১ম খন্ড সঙ্গে করে Voyage of the Beagle খ্যাত সেই সমুদ্রযাত্রা শুরু করেন। তিনি বাইবেলে বিশ্বাসী একজন খ্রিষ্টান হিসেবে তার যাত্রা শুরু করলেও, কিছুদিনের মাঝেই তিনি Agnostic বা অজ্ঞেয়বাদীতে পরিণত হন। ১৮৫৯ সালে যখন তিনি তার বিখ্যাত বই 'The Origin of Species' প্রকাশ করেন তখন এটি যেন হাজির হলো ইউরোপের ধর্মবিশ্বাসের জন্য একটা মৃত্যু পরোয়ানা হিসেবে! এই বইটির মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান অবশেষে মানব প্রজাতি এবং অন্য সকল প্রাণীর জীবনের উৎপত্তির একটি সহজসরল ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে সমর্থ হলো। নাস্তিকতার বিশ্বাসে যেন জোয়ার এনে দিলেন ডারউইন। বিশ্বজুড়ে এই ধারণা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল।

ডারউইন তার 'The Origin of Species' বইটিতে বলতে চেয়েছেন যে, মানুষ, বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং ইত্যাদি Ape জাতীয় প্রাণীর সূচনা হয় কোনো সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে; যেভাবে এককোষী জীব থেকে বহুকোষী জীবের উদ্ভব ঘটে। এই প্রক্রিয়ার নাম তিনি দিয়েছেন 'প্রাকৃতিক নির্বাচন', যা 'যোগ্যরাই টিকে থাকে' বা survival of the fittest নামে অধিকতর পরিচিত। এই সূত্র ধরে মার্ক্স মানব ইতিহাসের সকল ঘটনাকে ধনী-গরিবের মধ্যকার অর্থনৈতিক সংঘাতের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন। তার মতে, সবকিছুই বস্তুগত প্রয়োজন পূরণ নিয়ে সম্পদের কাড়াকাড়ি থেকে সৃষ্ট। এটিকে তিনি অভিহিত করেছেন 'শ্রেণি সংগ্রাম' নামে। তার কাছে যেকোনো সমাজব্যবস্থাকে দুটো শ্রেণিতে

বিন্যাস করা যাবে; প্রথমটি শাসক শ্রেণি এবং অপরটি শোষিত শ্রেণি। এভাবেই মার্ক্সবাদ অনুসারে ধর্ম হচ্ছে শাসকগোষ্ঠীর একটি হাতিয়ার, যার দ্বারা তারা সমাজে তাদের শাসনকর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখে। এ নাটকে ঈশ্বর হচ্ছেন এক কাল্পনিক চরিত্র, যে কি না কেবল ধনীদের বন্ধু। গরিবের উপর ধনীদের শাসনকর্তৃত্বের ছড়ি তুলে দেওয়া হয়েছে পূর্বপরিকল্পিতভাবে, 'ভাগ্যের দোহাই' দিয়ে।

ডারউইন মনে করতেন, সাদা চামড়ার ইউরোপিয়ানরা অন্যদের তুলনায় বেশি 'উন্নত'। যদিও ডারউইনের ধারণা ছিল বানর-সদৃশ কোনো প্রাণী থেকে বিবর্তন হতে হতে মনুষ্য প্রজাতির জন্ম, তথাপি তিনি মনে করতেন, মানুষের মধ্যেই আবার কিছু কিছু নরগোষ্ঠীর বিবর্তন অন্যদের তুলনায় বেশি সংঘটিত হয়েছে; তাই তারা অন্যদের থেকে উন্নত। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, অপেক্ষাকৃত স্বল্প-বিবর্তিত নরগোষ্ঠীর মধ্যে বানরের বৈশিষ্ট্য অধিকতর বিদ্যমান। ডারউইন তার 'The Decent of Man' বইয়ে (এটি প্রকাশিত হয়েছিল The Origin of Species এর পরে), সাদা-কালো বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মধ্যে বিবর্তনের তারতম্যের কারণে সৃষ্ট পার্থক্যগুলো নিয়ে বেশ জোরালো আলোচনা করেছেন।

ডারউইনিজম এবং ইসলামের মধ্যে বিরোধ মানব সৃষ্টির উৎস, উদ্দেশ্য এবং মর্যাদার দৃষ্টিকোণে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। ডারউইনিজম জীবনের বিবর্তনকে একটি দৈবচয়ন ও উদ্দেশ্যহীন প্রক্রিয়া হিসেবে উপস্থাপন করে, যেখানে মানুষ কেবল একটি প্রজাতি। পক্ষান্তরে, ইসলাম মানুষকে আল্লাহর সরাসরি সৃষ্টি এবং আশরাফুল মাখলুকাত (সৃষ্টির সেরা জীব) হিসেবে বিবেচনা করে, যা সৃষ্টির নিখুঁত পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের প্রকাশ।
"আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দিয়েছি; আমি তাদেরকে উত্তম রিযিক দিয়েছি এবং আমি তাদেরকে অনেক সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" (সূরা আল-ইসরা: ৭০)
এ আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায়, আল্লাহ মানুষকে শুধু সৃষ্টি করেননি, বরং তাদের মর্যাদাপূর্ণ স্থান দিয়েছেন।

ডারউইনিজমের মতো তত্ত্ব আল্লাহর সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং মানুষের আত্মিক দিককে অস্বীকার করে। কিন্তু ইসলাম সৃষ্টিকে আল্লাহর পরিকল্পনা এবং মানুষের জীবনের প্রতিটি ধাপকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের অংশ হিসেবে দেখে।
"তিনি যাকে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তাকে পূর্ণতা দান করেন। তিনি যা পরিকল্পনা করেন, তা বাস্তবায়িত হয়।" (সূরা আস-সাজদাহ: ৭)
এটি প্রমাণ করে, সৃষ্টিজগতে কোনো কিছুই এলোমেলো নয়। মানুষ এবং সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর জ্ঞানের অধীনে পরিচালিত। সুতরাং, ডারউইনিজমের মতো উদ্দেশ্যহীন তত্ত্ব ইসলামের সঙ্গে মেলানো সম্ভব নয়।

মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির অপূর্ব নিদর্শন, যার আত্মিক, শারীরিক, এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট্য আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার প্রমাণ। এটি আল্লাহর বাণীরই বাস্তবায়ন:
"তিনি বলেন, 'হও', আর তা হয়ে যায়।" (সূরা ইয়াসিন: ৮২)

- **সেকুলারিজম**

পশ্চিমা সভ্যতার মূলভিত্তি হলো সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা হলো সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মের পৃথকীকরণ বা শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মচর্চার অনুমোদন দেওয়া। তারা মনে করে-সেক্যুলারিজম থেকে উদ্ধৃত তাদের জীবনব্যবস্থা ও আদর্শ গোটা বিশ্বের মেনে নেওয়া উচিত। এর জন্য অন্যদের বাধ্য করাও তাদের দায়িত্ব বলে তারা মনে করে। কারণ, তাদের বিশ্বাস পশ্চিমা সভ্যতাই একমাত্র সঠিক ও আদর্শিক।
অথচ Secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতা হলো এমন এক সামগ্রিক বিশ্বাস, যা সমাজ ও রাষ্ট্রে ধর্মের চর্চাকে প্রত্যাখ্যান করে, শুধু ব্যক্তিগত ধর্মীয় ইবাদতের অনুমোদন করে। এ মতবাদ অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের কোনো প্রভাব গ্রহণযোগ্য নয়; নাগরিক নীতিমালা প্রণয়ন ও জাতীয় কর্মকাণ্ডে ধর্মীয় মূল্যবোধের কোনো প্রভাব থাকতে পারে না। অথচ ইসলাম যেমনিভাবে ব্যক্তিগত ইবাদতের ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়, অনুরূপ সামাজিক, রাষ্ট্রীয়

ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারেও নির্দেশনা দেয়। কেননা ইসলাম হলো একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা আছে। এসব নির্দেশনা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মানা ফরজ। তাই Secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতার মতবাদ সম্পূর্ণ কুফরি মতবাদ। ইসলামি সভ্যতা যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, ধর্মনিরপেক্ষতা তার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। ইসলামি সমাজের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে একজন মুসলিমের বিশ্বাস ও তার ইবাদত। একটি ইসলামি সমাজ মানেই হলো মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাস এবং কর্মের প্রতিচ্ছবি। ইসলামি শরিয়াহ আইনের ভিত্তিতেই মুসলিম জাতির শিক্ষাব্যবস্থা এবং নাগরিকনীতি পরিচালিত হবে। আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করা একটি চরম বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ এবং কুফর হিসেবে বিবেচিত। এই মূলনীতিটি পরিষ্কারভাবে কুরআনে উল্লেখ আছে-

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

"যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের "

ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ হচ্ছে বিবর্তন প্রক্রিয়ার একটি ফসলমাত্র। ধর্মনিরার মতো তার জীবনেরও তেমন বিশেষ কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই। ব্যাপারটা এককথায় এমন দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও দাও ফুর্তি করে, আগামীকাল বাঁচবে কিনা কে বলতে পারো।' এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অনেকের মনে হতে পারে, ধর্ম মানুষকে জীবন উপভোগ করতে ব্যাঘাত ঘটায়। কাজেই ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই, ধর্মের পুরো ব্যাপারটি পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। কেউ যদি নিজেদের 'রঙিন দুনিয়া' থেকে গুটিয়ে রাখতে চায় রাখুক, তবে বাকিরা যেভাবে খুশি সেভাবে জীবনযাপন করতে পারবে, ধর্মের সেখানে নাক গলানো চলবে না। এই চিন্তা হলো পশ্চিমা সভাতা ও আদর্শের ভিত্তি, যা সকল অনিষ্টতার জন্ম দিয়েছে।

- **গণতন্ত্র**

গণতন্ত্রের নাম এবং ধারণা- দুটোরই উদ্ভব ঘটেছে প্রাচীন গ্রিসে, যার অর্থ 'জনগণের শাসন'। প্রাচীন গ্রিসের নগর-রাষ্ট্রসমূহে, বিশেষত এথেন্সে, দাস এবং নারীদেরকে ভোটাধিকার দেওয়া হতো না। কার্যত অধিবাসীদের ২০ থেকে ৩০ ভাগের একটি ক্ষুদ্র অংশ ছিল সক্রিয় নাগরিক (২২) বর্তমান পশ্চিমা গণতন্ত্রের বাস্তবতাও খুব ভিন্ন কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে, শাসনকর্তৃত্ব বর্তমানে তার চেয়েও ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। 'শাসনকার্যে আমাদেরও অংশগ্রহণ রয়েছে' জনগণের মনে এমন একটি আবহ সৃষ্টি করতেই কেবল পশ্চিমারা নির্বাচন নাটক মঞ্চস্থ করে থাকে। অত্যন্ত সুকৌশলে তারা সাধারণ মানুষকে শাসনব্যবস্থায় কার্যকর অংশগ্রহণ থেকে দূরে রাখে। যেমন, অ্যামেরিকার মতো দেশে সরকার যেখানে অন্যান্য অনেক খাতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে, সেখানে সকল স্তরের শিক্ষা একারণেই বিনামূল্যে দেওয়া হয় না যে, সাধারণ শ্রেণির কেউ যেন সহজে সরকারব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করার মতো যোগ্য হয়ে উঠতে না পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা খুবই ব্যায়বহুল হওয়ার কারণে নিম্ন শ্রেণি থেকে আসা লোকদের বেশিরভাগই নিজেদের অবস্থা উত্তরণে ব্যর্থ হয়। তথাপি, দেখা যাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বিনামূল্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং ভর্তুকিযুক্ত আবাসনের পক্ষে রায় দিয়ে থাকে। অথচ হাইস্কুলের গন্ডি পেরোতেই বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এটি এজন্য নয় যে, অ্যামেরিকান সরকার শিক্ষার ব্যয়ভার বহনে অক্ষম; বরং এর উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা, যেন শিক্ষিত মুষ্টিমেয় এলিট শ্রেণির উপর অল্পশিক্ষিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন ধরে রাখা যায় এবং তাদের মুখাপেক্ষী বানিয়ে রাখা যায়। অথচ, অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে আক্রান্ত সুদানের মতো একটি দরিদ্র দেশও বিনামূল্যে শিক্ষার আর্থিক যোগান দিতে সমর্থ হয়েছে।

পশ্চিমা চিন্তাবিদদের দৃষ্টিকোণ থেকে, গণতন্ত্র নেহায়েত কেবল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়, বরং গণতন্ত্র একটি সামাজিক আদর্শ এবং দর্শনও বটে। তারা অত্যন্ত উচ্চাভিলাষের

সাথে ঘোষণা দেন, "পশ্চিমা গণতন্ত্র সরকারব্যবস্থার গন্ডি পেরিয়ে মানবীয় সম্পর্কের সকল পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।"

জীবনব্যবস্থা হিসেবে **গণতন্ত্র তিনটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।** এর প্রথমটি হলো সাম্যবাদ। যুক্তিবাদী মানবতাবাদের বিচারে, গোষ্ঠী, শ্রেণি, লিঙ্গ, জাত এবং ধর্মের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সকল মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে; আর সেটি হচ্ছে যুক্তি বা বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা। গণতন্ত্রের এই নীতিটি ইসলামের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক নয়। তবে ইসলামে সে সাম্যের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর উপর ঈমান। রসূলুল্লাহ বলেছেন,

"প্রতিটি শিশু তার ফিতরাত বা স্বভাবজাত বিশ্বাসের উপর জন্মগ্রহণ করে।"

গণতন্ত্রের দ্বিতীয় মূলনীতি হচ্ছে যুক্তিভিত্তিক অভিজ্ঞতাবাদ। এ তত্ত্ব অনুসারে মানুষের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং মানবীয় যুক্তিই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। ঐতিহাসিক এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মানবসমাজের জন্য সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা মানুষের আছে; এ জন্য কোনো ঐশ্বরিক বিধানের প্রয়োজন নেই। যদিও বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক অ্যামেরিকার সংবিধানের কথা, যেটি প্রণীত হয়েছিল ১৮ শতকের সেরা চিন্তাবিদ এবং সবচেয়ে জ্ঞানী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গের হাতে। এই সংবিধানে এমন একটি অনুচ্ছেদ আছে, যেটি একেবারে আগাগোড়া ত্রুটিপূর্ণ এবং পক্ষপাতদুষ্ট। অনুচ্ছেদ ১, 'তিন-পঞ্চমাংশে মীমাংসা' (The Three-Fifth Compromise) শীর্ষক ২য় খণ্ডে উল্লেখ আছে যে, একজন কৃষ্ণাঙ্গকে (তৎকালীন সমাজে যারা দাস শ্রেণিভুক্ত ছিল) একজন শ্বেতাঙ্গের তিন-পঞ্চমাংশ হিসেবে ধরা হবে। এই সংবিধানের রচয়িতাদের সকলেরই ক্রীতদাস ছিল এবং তারা তাদেরকে নিজেদের সমতুল্য মনে করতেন না। ফলে, সংবিধানে তারা স্রেফ নিজেদের কিংবা সমাজের প্রভাবশালীদের বিশ্বাস এবং ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন। তারা যেটাকে সঠিক বলে মনে করতেন সেটাকেই পরম সত্য ও ন্যায় বলে বিবেচনা করলেন। কোনটি আসলে ন্যায়, আর কোনটিই বা অন্যায়, মানবীয় যুক্তি এবং অভিজ্ঞতা প্রয়োগে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হলো না। ইউরোপ, এশিয়া কিংবা আফ্রিকার ইতিহাসে প্রচলিত আইনব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ আমাদের সামনে যে বাস্তবতা তুলে ধরে

তা হলো, মানুষ যখন আইন বা বিধিবিধান প্রণয়নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন সে তার সম্প্রদায়, শ্রেণি কিংবা মহলের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখেই আইন প্রণয়ন করে। তারা কখনোই সত্যিকার অর্থে সম্পূর্ণ পক্ষপাতমুক্ত হতে পারে না।

অপরদিকে ইসলামি সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মহান আল্লাহ, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই একমাত্র মানুষের প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যক অবগত। কোনো বিশেষ শ্রেণির সাথে তাঁর কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই; কাজেই একমাত্র তিনিই পক্ষপাতহীনভাবে পরিপূর্ণ ন্যায্য আইন প্রণয়নের বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা রাখেন। মানুষের ভূমিকা কেবল স্রষ্টার এই আইনের বাস্তবায়নে এবং সে আইনের মূলনীতির আলোকে গৌণ কোনো বিষয়ে নিয়ম-নীতি নির্ধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

গণতন্ত্রের তৃতীয় মূলনীতিকে অভিহিত করা হয় 'Discussion and consent' বা 'আলোচনা এবং অনুমোদন' শীর্ষক শিরোনামে। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে ধারণার উপর 'আলোচনা' নামক মূলনীতিটি দাঁড়িয়ে আছে তা হলো, পরম সত্য বলে কিছু নেই; কাজেই সকল মতকেই আলোচনায় স্থান দিতে হবে। প্রশ্নাতীত সত্য হিসেবে কোনো কিছুকেই গ্রহণ করা যাবে না। সকলের মত প্রকাশ করার পর, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

এ দৃষ্টিভঙ্গির অনিবার্য পরিণতি হলো, এখানে সত্য-মিথ্যা সবকিছুই আপেক্ষিক হয়ে যায়, পরম সত্য বা মিথ্যা বলে আর কোনো কিছুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। আজ যেটাকে ভালো মনে করে গ্রহণ করা হয়, সেটি হয়তো কাল খারাপ হিসেবে পরিগণিত হবে এবং এর উল্টোটাও হতে পারে! এই ধরনের দর্শনের প্রভাবে একটি সমাজে নৈতিকতার শাশ্বত ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ হয়ে যায়।

- **পুঁজিবাদ**

পুঁজিবাদ’ শব্দটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদ সোমবার্টের লেখায় সর্বপ্রথম স্বীকৃতি লাভ করে। বেশি অর্থ উপার্জনের মূল উদ্দেশ্য থেকে পুঁজিবাদের জন্ম। পুঁজিবাদে অর্থ উপার্জনের মানসিকতা অনিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এই ব্যবস্থা একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি, মানবহির্ভূত পণ্য উৎপাদন, অপব্যয় ও বিলাসসামগ্রীর অত্যধিক ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। অসংযম, স্বার্থপরতা, শিশুশ্রম ও নারী নির্যাতন পুঁজিবাদেরই সৃষ্টি। মজুদদারি, সুদি কারবার, ধোঁকাবাজি ও জালিয়াতি-প্রতারণা থেকে পুঁজিবাদের জন্ম।

মানবজাতির অগ্রগতিতে পুঁজিবাদের অবদান থাকলেও সমাজকে দূষিত করার ক্ষেত্রেও তার অবদান সবচেয়ে বেশি। বিশ্বব্যাপী সহিংসতা, মন্দা, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতিসহ প্রবল মানবিক বিপর্যয় পুঁজিবাদের কারণেই ঘটছে। পুঁজিবাদ একদিকে সুদখোর, শোষক ও জালেম জমিদার তৈরি করছে, অন্যদিকে সৃষ্টি হচ্ছে মজুর-কৃষকদের এক সর্বহারার দল। পুঁজিবাদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা এবং অনৈতিকতার জন্ম দিয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধর্মকে গুরুত্বহীন এবং নীতি-নৈতিকতাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে।
পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি তিনটি। যথা—

- ব্যক্তিমালিকানা : এই অর্থব্যবস্থায় প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিমালিকানার অধিকার আছে। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণও ব্যক্তিগত মালিকানায় রাখতে বাধা নেই।
- ব্যক্তিগত লাভ : উৎপাদনের বেলায় যে উদ্যোগ কাজ করে সেটি প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত লাভ অর্জনের জন্য চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।
- রাষ্ট্রের প্রভাবমুক্ত : পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ব্যবসায়ী রাষ্ট্রের প্রভাবমুক্ত। ব্যক্তি তার ইচ্ছামতো ব্যবসায় পরিচালনা করবে এবং কেউ তার স্বাধীনতায় কোনো হস্তক্ষেপ করবে না।

অধ্যাপক হাম পুঁজিবাদের চারটি ত্রুটি উল্লেখ করেছেন।
১. পুঁজিবাদে সম্পদ ও আয়ের সমবণ্টন আর্থ-সামাজিক ক্ষমতা নিরূপণে অসমতা সৃষ্টি করে,

২. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মাত্রাতিরিক্ত প্রতিযোগিতা ও সুদি কারবারের ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়,
৩. পুঁজিবাদ একচেটিয়াবাদের জন্ম দেয় এবং
৪. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বেকার সমস্যা অপেক্ষাকৃত বেশি।

পুঁজিবাদ বিপরীতে ইসলাম মানবজাতির জন্য একটি সুন্দর বিকল্প ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে। ইসলামে মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে এবং তার সামনে ভালো ও মন্দ দুটি পথই খুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে মানুষ এই স্বাধীনতা একটি নৈতিক মানের ভেতর দিয়েই শুধু ভোগ করতে পারে। এই স্বাধীনতা অনিয়ন্ত্রিত নয় মোটেও। কেননা মানুষকে তার কর্মকাণ্ডের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণের জন্যই দুনিয়ার সব কিছু সৃষ্টি করেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। মানুষ এসব সম্পদ ব্যবহার করবে এবং এর কল্যাণ গ্রহণ করবে। তবে যাবতীয় অনৈতিকতামুক্ত হয়ে আল্লাহর এ সম্পদরাজি ব্যবহার করতে হবে। ইসলাম এমন এক অর্থব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে, যাতে সমাজের সব মানুষ তা থেকে কল্যাণ লাভ করতে পারে এবং এর ফলে সমাজের মানুষের মধ্যে সব ধরনের ব্যবধান, বৈষম্য ও শোষণ-পীড়ন দূরীভূত হয়। ইসলামী ব্যবস্থার কারণে অর্থসম্পদ কারো হাতে জমা হয়ে থাকতে পারে না, বরং তা প্রতিনিয়ত আবর্তিত হয়ে গোটা সমাজের মানুষের প্রয়োজনে ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর নির্দেশনা হচ্ছে,

‘তোমরা সম্পদ এমনভাবে বণ্টন করবে, যাতে ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তবানদের মাঝেই শুধু আবর্তিত না থাকে।’ (সুরা : হাশর, আয়াত : ৫৯ : ৭)

ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো, সব সম্পদ আল্লাহর। মানুষ সেটি খোদায়ি বিধান মতে ন্যায়-ইনসাফপূর্ণভাবে ব্যবহার করবে। এ ক্ষেত্রে সব নৈতিক মানদণ্ড মেনে চলবে। ধোঁকা, প্রতারণা, মজুদদারি, ওজনে কম দেওয়াসহ সুদ দেওয়া-নেওয়া থেকে বিরত থেকে মানুষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে।

অনুকরণের বেড়াজাল

পাশ্চাত্যের সভ্যতা এমন জীবন বিধ্বংসী হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম কেন এ সভ্যতার অনুসারী। এর কারণ হলো আধিপত্য দু- প্রকার প্রথমটি মানসিক ও নৈতিক আধিপত্য, আর দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক ও বস্তুগত। প্রথম শ্রেণির আধিপত্য হলো, কোনো জাতি যখন চিন্তা, গবেষণা, আবিষ্কার ও মানসিক শক্তিতে বিপুলভাবে উন্নতি লাভ করে, তখন অন্যান্য জাতি স্বভাবতই তার চিন্তাদর্শের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে। তার ধ্যান-ধারণা, ধর্মবিশ্বাস ও মতাদর্শ তাদের মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে ফেলে; তারই ছাঁচে তাদের মানসিকতা গড়ে ওঠে। তার সভ্যতাই তাদের আপন সভ্যতায় পরিণত হয়। তার জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই তারা নিজস্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করে নেয়। এমনকি তার ভালো-মন্দ ও সত্যাসত্যই তাদের কাছে ভালো-মন্দ ও সত্যাসত্যের মানদণ্ড বলে বিবেচিত হয়।

দ্বিতীয় প্রকার আধিপত্য হলো-কোনো জাতি যখন বস্তুগত সমৃদ্ধির দিক থেকে অতীব শক্তিশালী হয়, তখন তার মোকাবিলায় অন্যান্য জাতি নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সামগ্রিকভাবে কিংবা আংশিকভাবে অন্যান্য জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর জেঁকে বসে।

পক্ষান্তরে গোলামি বা পরাধীনতাও দু-প্রকার-প্রথমটি মানসিক আর দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক। উপরে আধিপত্য প্রসঙ্গে দুটি শ্রেণির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, গোলামির এ দুটি শ্রেণি ঠিক তার বিপরীত।

এক হিসেবে আধিপত্যের এই দুটি শ্রেণি সম্পূর্ণ আলাদা। কোথাও মানসিক প্রাধান্য বিস্তৃত হলে রাজনৈতিক আধিপত্যও প্রতিষ্ঠিত হবে, এমনটি অনিবার্য নয়। কিংবা রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে মানসিক প্রাধান্যও কায়েম হয়ে যাবে, এরও কোনো বাধা-ধরা নিয়ম নেই। তবে প্রকৃতির নিয়ম হলো, কোনো জাতি চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা এবং জ্ঞান সাধনা ও তথ্যানুসন্ধানের পথে অগ্রসর হলে, মানসিক উন্নতির সাথে সাথে বৈষয়িক অগ্রগতিও সে অর্জন করে। পক্ষান্তরে কোনো জাতি চিন্তা ও জ্ঞান-গবেষণার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়লে মানসিক অবনতির সাথে সাথে তার বৈষয়িক অধঃপতনও শুরু হয়ে যায়। পরন্তু আধিপত্য শক্তিমত্তা আর পরাধীনতা দুর্বলতার পরিণতি বিধায় মানসিক ও বৈষয়িক দিক থেকে দুর্বল ও নির্বীর্য জাতিগুলো তাদের দুর্বলতা ও নির্বীর্যতার পথে যত এগিয়ে চলে, সেই অনুপাতেই তারা গোলামি ও পরাধীনতার শিকার হতে থাকে; আর এই উভয় দিক থেকে শক্তিমান জাতিগুলো তাদের মন-মগজ ও দেহ-সত্তার উপর কর্তৃত্বশীল হয়ে বসে।

বর্তমানে মুসলমান এই দ্বিবিধ গোলামিরই শিকার। কোথাও উভয়বিধ গোলামি পুরোপরি বর্তমান, আবার কোথাও রাজনৈতিক গোলামি। এটি কিছুটা কম হলেও মানসিক গোলামি সমধিক। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে কোনো মুসলিম জনপদই সত্যিকারভাবে রাজনৈতিক ও মানসিক দিক দিয়ে পুরোপুরি স্বাধীন নয়। কোথাও তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ভোগ করলেও নৈতিক ও মানসিক গোলামি থেকে আদৌ মুক্ত নয়। তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, হাট-বাজার, সভা-সমিতি, ঘরবাড়ি, এমনকি তাদের আপন দেহ পর্যন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি, চিন্তাধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান তাদের উপর পুরোমাত্রায় কর্তৃত্বশীল। তারা পাশ্চাত্যের মগজ দিয়ে চিন্তা করে, পাশ্চাত্যের চোখ দিয়ে দেখে, পাশ্চাত্যের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে চলে। তারা উপলব্ধি করুক আর নাই করুক, তাদের মগজের উপর এই ধারণাই চেপে রয়েছে যে, পাশ্চাত্য যাকে সত্য মনে করে, তা-ই সত্য, আর সে যাকে মিথ্যা ঘোষণা করছে, তা-ই মিথ্যা। তাদের মতে সততা, যথার্থতা, সভ্যতা নৈতিকতা, ভদ্রতা, শালীনতা ইত্যাদি ব্যাপারে পাশ্চাত্যের নির্ধারিত মানদণ্ডই হচ্ছে একমাত্র নির্ভুল মানদণ্ড। এমনকি নিজেদের দীন ও ইমান, চিন্তাধারা ধ্যান-ধারণা, সভ্যতা ও শালীনতা, চরিত্র ও রীতিনীতি, সব কিছুই তারা ঐ মানদণ্ডে যাচাই করে। যে জিনিস এই মানদণ্ডে পুরোপুরি উত্তীর্ণ, তাকেই অরা যথার্থ বলে মনে করে; তার সম্পর্কে

তারা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যায় এবং জিনিসটি পাশ্চাত্য মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে গর্ববোধ করে। আর যা কিছু এই মানদণ্ডের বিচারে উত্তীর্ণ নয়, তাকে তারা সচেতনভাবে হোক কিংবা অচেতনভাবে ভ্রান্ত বলে মনে করে। কেউ তাকে প্রকাশ্যে বর্জন করে, কেউ মনে মনে বিরক্তি বোধ করে এবং কোনো রকম টেনে হিঁচড়ে তাকে পাশ্চাত্য মানদণ্ডে উতরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই গোলামির কারণ কী? সংক্ষেপে বললে তা নিম্নরূপ দাঁড়ায়-

মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় চিন্তা-গবেষণা ও জ্ঞান সাধনার উপর। যে জাতি এ পথে অগ্রগামী, সে-ই দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসন অলংকৃত করে; তার চিন্তাধারাই গোটা দুনিয়াকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। পক্ষান্তরে যে জাতি এ ক্ষেত্রে পেছনে পড়ে থাকে, তাকে স্বভাবতই অন্যের অনুবর্তী ও অনুসারী হয়ে থাকতে হয়। তার চিন্তাধারা ও মতাদর্শে লোকদের মস্তিষ্কের উপর আধিপত্য বিস্তার করার মতো কোনো শক্তিই বাকি থাকে না। জ্ঞানসাধক ও সত্যানুসন্ধিৎসু জাতির শক্তিশালী চিন্তা ও মতবিশ্বাসের বন্যা-প্রবাহ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার মতো শক্তি-সামর্থ্য পর্যন্ত তার মধ্যে থাকে না। মুসলমানরা যত দিন সত্যানুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান সাধনার পথে অগ্রসর ছিল, তত দিন দুনিয়ার সকল জাতি তাদের অনুসরণ ও অনুবর্তন করে চলেছে। ইসলামি চিন্তাধারা সমগ্র মানবজাতির চিন্তা-দর্শনকে আচ্ছন্ন করেছিল। ভালো-মন্দ, সুকৃতি-দুষ্কৃতি, ভ্রান্তি-অভ্রান্তি সম্পর্কে ইসলামের নির্ধারিত মানদণ্ড-সজ্ঞানে হোক আর অজ্ঞানে, সমগ্র দুনিয়ার কাছে একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। আর দুনিয়ার লোকেরা কি ইচ্ছায়, কি অনিচ্ছায় তাদের চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডকে সেই মানদণ্ডের আদলেই গড়ে তুলেছিল। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে চিন্তানায়ক ও গবেষকের আবির্ভাব যখন বন্ধ হয়ে গেল, তারা ত্যাগ করল চিন্তা-ভাবনা ও সত্যানুসন্ধিৎসা এবং জ্ঞান- সাধনা ও চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন তারা দুনিয়ার নেতৃত্ব থেকে যেন অবসর গ্রহণ করল। অন্যদিকে পাশ্চাত্য জাতিগুলো এই সকল ক্ষেত্রেই দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল। তারা চিন্তা-গবেষণার শক্তিকে কাজে লাগাল: বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে আত্মনিয়োগ করল; প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তিগুলোর উৎস সন্ধান করল। এর অনিবার্য পরিণতি যা হওয়ার তা-ই হলো। পাশ্চাত্য জাতিগুলো

দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসন দখল করে বসল। একসময় যেভাবে দুনিয়ার লোকেরা মুসলমানদের কর্তৃত্বের সামনে নতি স্বীকার করেছিল, তেমনি তাদেরও পাশ্চাত্য জাতিগুলোর কর্তৃত্ব মেনে নিতে হলো।

চার-পাঁচ শতক পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের পূর্ব পুরুষদের বিছানো সুখশয্যায় অঘোরে ঘুমাচ্ছিল, আর পাশ্চাত্য জাতিগুলো ছিল নিজেদের উন্নয়নের কাজে লিপ্ত। এরপর সহসা পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর অভ্যুত্থান ঘটল এবং মাত্র এক শতকের মধ্যেই তারা গোটা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ল। ঘুমের ঘোরে চোখ মেলে তাকিয়েই মুসলমানরা দেখতে পেল, খ্রিষ্টান ইউরোপ লেখনী ও তরবারি উভয় দিক থেকেই সুসজ্জিত; আর এই দ্বিবিধ শক্তির সাহায্যেই তারা গোটা দুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। একটি ক্ষুদ্রাকৃতির দল এর মোকাবিলায় প্রতিরক্ষার চেষ্টা করল; কিন্তু তার না ছিল লেখনীর শক্তি, আর না ছিল তরবারির তেজ। ফলে তারা শুধু পরাজয়ই বরণ করতে লাগল। জাতির বাকি অংশ অর্থাৎ সংখ্যাগুরু দলটি যে কর্মনীতি অবলম্বন করল, দুর্বল ও কাপুরুষরা চিরকাল তা-ই করে থাকে। তরবারির তেজ, যুক্তির বল, বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য-প্রমাণের সমর্থন এবং চোখ ধাঁধানো রূপ-সৌন্দর্যসহ যে ধ্যান-ধারণা, মতাদর্শ ও রীতিনীতি পাশ্চাত্য থেকে এল, আরামপ্রিয় মস্তিষ্ক ও পরাভূত মানসিকতা তাকে একেবারে ইমানের মর্যাদা দিয়ে বসল। যেসব পুরানো ধর্মবিশ্বাস, নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক আইন-কানুন নিছক গতানুগতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই নতুন ও শক্তিশালী বন্যার স্রোতে তা খড়কুটোর মতো ভেসে গেল। আর চেতনাহীনতার এ পথে লোকদের মন-মগজে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, পাশ্চাত্য থেকে যা কিছু আসে, তা-ই সত্য এবং তা-ই হচ্ছে সভ্যতা ও বিশুদ্ধতার একমাত্র মানদণ্ড।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে অন্য যেসব জাতির সংঘর্ষ হয়েছে, তাদের কারও কারও তো স্থায়ী ও স্বতন্ত্র কোনো সভ্যতাই বর্তমান ছিল না। কারও কারও কাছে একটা স্বতন্ত্র সভ্যতা ছিল বটে, কিন্তু তা অন্য সভ্যতার মোকাবিলায় আপন স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে রাখার মতো শক্তিশালী ছিল না। আবার কারও কারও সভ্যতার সাথে এই নবাগত সভ্যতার তেমন কোনো মৌলিক পার্থক্যই ছিল না।

ফলে এই সকল জাতি অতি সহজেই পাশ্চাত্য সভ্যতার রঙে রঙিন হয়ে গেল এবং কোনো বড় রকম সংঘর্ষেরই প্রয়োজন দেখা দিল না। কিন্তু মুসলমানদের ব্যাপারটা ছিল তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরা একটি স্থায়ী, স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার অধিকারী। এদের সভ্যতার একটি নিজস্ব ও পূর্ণাঙ্গ নিয়ম-নীতি ও বিধি-ব্যবস্থা, চিন্তা ও কর্ম উভয় দিক থেকেই জীবনের তামাম বিভাগের উপর পরিব্যাপ্ত। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলনীতি ও ভিত্তি সম্পূর্ণ এই সভ্যতার পরিপন্থি। এ কারণেই প্রতি পদক্ষেপে এই দু-সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত দানা বেঁধে উঠেছে। আর এই সংঘাতের ফলে মুসলমানদের চিন্তা-বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

এই গোলামীর ভবিষ্যতে বাণী রাসূল সাঃ ১৪শ’ বছর আগেই করে গিয়েছিলেন।

আবু সাইদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'অবশ্য অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির লোকদের নীতি-পদ্ধতিতে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি দবের (গুইসাপ-গিরগিটির) গর্তে ঢুকে, তাহলে ইহুদি-নাসারাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, (পূর্ববর্তী জাতি বলতে) এরা কি ইহুদি-নাসারা? তিনি বললেন, তাহলে আর কারা?' (সহিহ বুখারি: ৭৩২০)

পশ্চিমা সভ্যতা নাকি ইসলামি সভ্যতা কোনটি আমার পছন্দ

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা প্রতিয়মান যে পশ্চিমা সভ্যতার বহিরাংশ চাকচিক্য পূর্ণ হলেও এটি মূলত অন্তঃসার শূন্য একটি সভ্যতা। এই সভ্যতা মানবসমাজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষে নিয় গেলে এটি মানবিক, চারিত্রিক, আধাত্মিক সকল ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আদিম কাল থেকে সমাজের সভ্যতার শিক্ষা ছিল ত্যাগেই সুখ, ভোগে নয়। কিন্তু বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা ভোগবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। যার ফলে ত্যাগের মাধ্যমে যে সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব তারা সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে।

মূলত মানুষের তৈরি মতবাদ কখনই সম্পূর্ণ রূপে সঠিক হবে না। তাতে থাকবে বিস্তর সীমাবদ্ধতা। মানুষ স্বভাবতই নিজ প্রবৃত্তির অনুগামী। তাই মানব সৃষ্ট আঈন, সমাজ ব্যবস্থা, সভ্যতা বাহ্যত দৃষ্টিতে সুন্দর সঠিক মনে হলেও এতে থেকে যাবে ক্রুটির সমারহ। পশ্চিমা সভ্যতার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটিই কার্যকর হয়েছে।

অন্যদিকে ইসলামি সভ্যতার মূলভিত্তি ইসলাম, যা আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। স্রষ্টার চেয়ে উত্তম ভাবে কেউই অবগত নয় যে কিসে আমাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ রয়েছে। তাঁর আরোপিত বিধানই আমাদের জন্য শতভাগ উপযুক্ত।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ঘোষণা দেন যে :

فَمَنۡ زُحۡزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدۡخِلَ الۡجَنَّۃَ فَقَدۡ فَازَ ؕ وَ مَا الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الۡغُرُوۡرِ

“সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী।”(সূরা আল-ইমরান: ১৮৫)

অর্থাৎ বাহ্যিক চাকচিক্য পূর্ণ এই দুনিয়া একজন মুমিমনের নিকট ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া কিছুই না। এবং তাদের নিকট সাফলতা নশ্বর দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাদের কাছে সফলতা তো সেটাই যেটা তাদের রব তাদেকে শিখিয়েছে।

সুতরাং একজন সফল মুমিন হওয়ার জন্য আমি ইসলামি সভ্যতাকেই বেছে নিবো। কারণ এই সভ্যতার মধ্য দিয়ে আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার মনোনীত জীবনব্যবস্থা মোতাবেক জীবন ধারণ করতে পারবো।

উপসংহার

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা অতীতের বিভিন্ন সভ্যতার আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে কওমে আদ, সামুদ, সাবা এবং নিকট অতীতের রোম সভ্যতার আলোচনা উল্লেখযোগ্য। সমকালীন প্রেক্ষাপটে এসব সভ্যতার বেশ বাহ্যিক উন্নতি ছিল। তারা নিছক আমোদ-ফুর্তি বা যশ-খ্যাতির জন্যই বড় বড় ভবন নির্মাণ করত এবং তাদের যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা এতটাই উন্নত ছিল যে, তা দেখে মনে হতো তারা এর চেয়ে উন্নত কোনো শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

কিন্তু কুরআনুল কারিমে এসব সভ্যতা নিয়ে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা ছিল তাদের আকিদা-বিশ্বাসের স্বরূপ তুলে ধরা, বাহ্যত এতো উন্নতির পরেও যা তাদের ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তাই কুরআন খুবই গুরুত্বের সাথে তাদের আকিদা-বিশ্বাসগুলো তুলে ধরেছে। যে চিন্তাচেতনার উপর তাদের সভ্যতার ভিত রচিত হয়েছে, কুরআন সেগুলো বিস্তর বর্ণনা করেছে।

আলোচিত সভ্যতাগুলো মৌলিকভাবে সৃষ্টি, স্রষ্টা, জীবন-জগতের শুরু- শেষ, মানুষের পুনরুত্থান ও বিচারদিবস এসব বিষয়ে অবিশ্বাসী ছিল। তারা মনে করত এই বিশাল জগত কারো সৃষ্টি নয়, এগুলো ঘটনাক্রম এবং জীবনমাত্র একটাই। এই ইহজগতের পর আর কোনো জীবন নাই, যেখানে মানুষ কোনো প্রতিপত্তিশালী স্রষ্টার সামনে হিসাবের সম্মুখীন হবে। তারা বলত- আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন।

'আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা (কখনো) পুনরুত্থিত হবো না' (মুমিনুন- ৩৭)।

তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পরিবর্তে তাদের মধ্যে যারা দীনে হকের চরম বিরোধী ও উদ্ধত চরিত্রের অধিকারী ছিল, তাদের আদেশ-নিষেধই পালন করত। (তারা) উদ্ধত বিরোধীদের আদেশ পালন করেছে' (হুদ-৫৯)।

ফলে তাদের ধ্বংস ছিল অনিবার্য। 'অতঃপর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে তারা সকালবেলায় নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল' (আরাফ-৭৮)।

এই অবিশ্বাস তাদের এতটাই স্বেচ্ছাচারিতার প্রণোদনা দিয়েছিল যে, তারা এক সীমাহীন অনৈতিক সমাজ গড়ে তুলেছিল। সেখানে সত্য ও নৈতিকতার প্রতি আহ্বানকারীদের বলা হতো গোঁড়া ও সেকেলে।

ঠাট্টা করা হতো এই বলে যে, ***'তুমি তো দেখছি বিরাট সাধু' (আরাফ ৮২)!***

সত্য ও মিথ্যা, ভালো-মন্দ ও পাপ-পুণ্য নির্ধারণ করত তাদের মন, তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। ফলে তারা একেকজন হয়ে উঠেছিল চিন্তায় আল্লাহর দাসত্বমুক্ত এক সত্তা। নিজেরাই হয়ে উঠেছিল নিজেদের রব।

সন্দেহাতীত ভাবে বর্তমানে পশ্চিমারাও এইসব বৈশিষ্ট্যই ধারণ করে। যার দরুণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ধ্বংস করেছিল এর পূর্বের বহু জাতি। তাহলে আমরা কি নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছি এই পশ্চিমা সভ্যতার অনুকরণের মাধ্যমে? প্রশ্ন রইলো বিবেকের কাছে!

গ্রন্থপঞ্জি

অবাধ্যতার ইতিহাস -ডা. শামসুল আরেফীন

সভ্যতার সংকট - ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস

সভ্যতার এপিট ওপিট - মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ খান

হিউম্যান বিয়িং - ইফতেখার সিফাত

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত - মুহাম্মদ আসাদ, অনূদিত- জাকারিয়া মাসুদ

মুসলিম জাতির ইতিহাস (১ম খন্ড) -ড. সুহাইল তাক্কুশ

বিভিন্ন ওয়েবসাইট